পঞ্চম সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৬
চৈত্র ১৪০২

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক-প্রশাসন সাময়িকী □ পঞ্চম সংখ্যা □ মার্চ ১৯৯৬ □ চৈত্র ১৪০২

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

© ১৩৯৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১১-৯ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা-৩০/বাজা-৪/৯৫
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
Cover Design	:	Qazi Azad
বিনিময় মূল্য	ঃ	পনের টাকা
Price	:	Taka Fifteen only

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 5, March 1996, Chaitra 1402

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : Mohammad Jahangir Hossain

© 1398

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka.

Telephone	:	831711-9 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
BPATC	:	Pub-30/BJ-4/96
BPATC Library	:	351.0005

N.B.
26/06

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সম্পাদনা পরিষদ

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
কাজী শামসুল আলম
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

লেখকের জ্ঞাতব্য

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে লোকপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ, আলোচনা অথবা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়

* মূলকপিসহ পাণ্ডুলিপির ৩ প্রস্থ সম্পাদক, লোকপ্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা- এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে

* লেখা রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত অথবা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত, পূর্বে অপ্রকাশিত এবং অনধিক ২০ পৃষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়

* প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ, পাদটীকা, প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, বৎসর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, খণ্ড, ইস্যুর সংখ্যা, বৎসর ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে মূদ্রিত লেখার জন্য পৃষ্ঠা প্রতি ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের বিধান রয়েছে

* অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি — ১
মাহবুব তালুকদার

২. বাংলাদেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ — ১১
গোলাম মোস্তাকীম

৩. বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ — ২৯
মুহাম্মদ হাসান ইমাম

৪. পরিবেশ দুষণ ও সংরক্ষণ ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত — ৪৩
কাজী হাসান ইমাম

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিমাণগত পদ্ধতির ভূমিকা পর্যালোচনা — ৭১
ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান

৬. উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত — ৭৯
জোবায়ের এনামুল করিম

৭. বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন — ৯১
মোহাম্মদ আলী

৮. ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন — ১০১
মোহাম্মদ আবু ইউসুফ

৯. ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহ — ১০৯
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

১০. উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল — ১২৭
মোঃ হাসিবুর রহমান

১১. সভার কর্মপত্র ও কার্যবিবরণী ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ — ১৩৯
মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

১২. সাধু ও চলিত ভাষা ঃ উৎপত্তি ও প্রয়োগ — ১৫১
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

১৩. দুর্যোগের সাথে বেঁচে থাকা ঃ ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ — ১৬৫
* আব্দুর রউফ * ডাক্তার গোলাম মওলা * ফেরদৌসী বেগম
* সালমা বেগম * মোঃ শাহজাহান *আব্দুল্লাহ আল মাহবুবুর রশীদ
* ডাঃ নাজমা বেগম * মাহফুজা বেগম

সম্পাদকের কথা

দীর্ঘ বিরতির পর লোকপ্রশাসন সাময়িকী আবার প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা আমাদের পাঠকের কাছে এই অনিচ্ছাকৃত বিরতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতোমধ্যে সাময়িকীর ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং অনুবৃত্তিক্রমে পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা আগের মতই লোকপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ক্ষেত্রপ্রশাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখার আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের বর্তমান সংখ্যাগুলোকে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য নিবেদন করছি। চতুর্থ সংখ্যা থেকে কেন্দ্রের যে সকল বিষয়ে শ্রেণীকক্ষ আলোচনা হয়ে থাকে সে সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যসামগ্রী প্রবন্ধ আকারে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী'র মানোন্নয়নের জন্য মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই। লোকপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা বিশ্লেষণ, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ অথবা পুস্তক সমালোচনা লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল।

– সম্পাদক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি

মাহবুব তালুকদার*

১। সংস্কৃতি কী?

১.১ সংস্কৃতির বহুবিধ সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে। প্রতীচ্য-দেশে সংস্কৃতির নাকি একশ' ষাটটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এদেশে সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, "সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্যপাঠের মারফতে, ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে বিচিত্র-দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা[১]।"

১.২ আরেকটি ছোট সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁর ভাষায়, "দেশের লোকের যা-ই সংস্কার, তাই দেশের সংস্কৃতি[২]।"

১.৩ সংস্কৃতি বলতে সাধারণত দু' টি বিষয় বোঝায়। এক, বস্তুগত সংস্কৃতি, দুই, মানস-সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি, আহার-বিহার, জীবনযাপন প্রণালী-এসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর সাহিত্যে-দর্শনে, শিল্পে-সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বলা যায় মানস-সংস্কৃতি। বস্তুগত ও মানস-সংস্কৃতি মিলিয়েই কোন দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে[৩]। বস্তুগত সংস্কৃতি দৃশ্যমান বিষয়, কিন্তু মানস-সংস্কৃতি বিমূর্ত।

---

* সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

(১) মোতাহের হোসেন চৌধুরী, 'সংস্কৃতি কথা, সমকাল প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৫ পৃঃ ১৬-১৭।

(২) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, 'একুশে ফেব্রুয়ারি, বক্তৃতামালায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কিত অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৭৬।

(৩) আনিসুজ্জামান, আমাদের সংস্কৃতি (প্রবন্ধ), দৈনিক ইত্তেফাক, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮৫।

(৪) ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, বঙ্গসংস্কৃতি (প্রবন্ধ), 'বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, পৃঃ ১৮৪।

২। সংস্কৃতি ও জাতীয়তা

২.১ সংস্কৃতি ও জাতীয়তা দু'টি ভিন্ন বিষয়। জাতিসত্তা এবং জাতীয়তাও এক বিষয় নয়। জাতিসত্তা হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আমাদের জাতিগত পরিচয়। অন্যদিকে জাতীয়তা বলতে নাগরিকত্বকে বোঝায়। এক সময়ে এদেশের মানুষ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অধিবাসী ছিল। পরবর্তীকালে তারা 'পাকিস্তানী' হয়। বর্তমানে আমরা 'বাংলাদেশী' হয়েছি। কিন্তু আমাদের জাতিসত্তার পরিচিতি 'বাঙ্গালী' আগের মতই রয়ে গেছে। ফলে জাতীয়তা ও জাতিসত্তাকে একত্র করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি যথার্থ কাজ নয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি বললে বাংলাদশীদের সাংস্কৃতিক পটভূমি না বুঝে আবহমান বাংলার প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বুঝতে হবে।

২.২ সাংস্কৃতিক সীমানা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানার আনুগত্য করে না বরং সে রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে যায়। রাষ্ট্র-পরিচয় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিচয় রাতারাতি পাল্টায় না। একই সংস্কৃতির বিশাল সীমানায় নানা প্রয়োজনে মানুষ রাষ্ট্রীয় গণ্ডি টানে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন গ্রীসে হেলেনীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল অসংখ্য রাষ্ট্র। সংস্কৃতি ও জাতীয়তার আলোচনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎস ও বৈশিষ্ট্য

৩.১ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমির বৈশিষ্ট্য বিচিত্রমুখী। এ এলাকার আদি জনগোষ্ঠী ছিল প্রাক-আর্য জনসম্ভূত। পরবর্তীকালে আর্যদের প্রভাব পড়ায় আদি জনপ্রবাহের চিন্তা ও চেতনায় রূপান্তর ঘটে। মুসলমানদের এদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে তুরস্ক, আরব, ইরান ও মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব পড়ে এখানকার মানুষের মধ্যে। পরবর্তীকালে ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের আগমনে একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ফল্গুধারা বাংলার মাটি ও মানুষের জীবনে সঞ্চারিত হয়। এভাবে কালের বিবর্তনে নানা রূপ-রস নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।

৩.২ এদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয় পেতে হলে বিদেশী ও বিজাতীয় মানুষদের শরণাপন্ন হতে হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর কারণে প্রাচীন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা নিজেদের পরিচয় খুঁজে ফিরেছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বাৎসায়নের কামসূত্রে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, মুরারীর অনর্ঘ রাঘব গ্রন্থে, চালুক্যে, কালিদাসে, হিউয়েন সাং, মেগাস্থিনিস, ফাহিয়েন, বার্নিয়েরর বর্ণনায়[(৪)] ।

৩.৩ প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর জ্ঞানচর্চার পরিচয় গৌরবপূর্ণ। বাঙ্গালীর জ্ঞানস্পৃহা তখন থেকে চারদিকে সুখ্যাতি লাভ করেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গগৌরব

শীলভদ্রের খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। তিব্বতীয় রাজার আমন্ত্রণে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সুদূর তিব্বতে গিয়েছিলেন। গদাধর, মদন, রামচন্দ্র, কবি ভারতী, বাসব বিশ্বেশ্বর প্রমুখ বঙ্গসন্তান বিদেশে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ইতিহাস রেখে গেছেন। কহ্লান বলেছেন, বিদ্যাচর্চার জন্য বাঙ্গালী কাশ্মীর পর্যন্ত যেত।

৩.৪ বাঙ্গালীর আদি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে লেখা কর্পূরমঞ্জরীতে। তাতে বলা হয়েছে, হরিকেলের রমণীরা প্রাচ্যের সকল রমণীর তুলনায় সাহসী, চম্পা নগরীর চাঁপা ফুলের মত স্বর্ণের অলংকার তাদের পরিধানে, তারা রাধার মত আকর্ষণীয় এবং রূপঐশ্বর্যে কামরূপকে জয় করেছে। হরিকেলবাসীর কেলিতে এরা অংশ নিতেন। ধারণা করা হয়, এই হরিকেল বাংলাদেশের অংশ। আর্য সভ্যতার বাইরে থেকেও এদেশবাসী ঐশ্বর্যশালী রুচির অধিকারী ছিল বলে এ উক্তি থেকে অনুমান করা যায়।

৩.৫ এ সময়ে বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা কী ছিল, তা জানা যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' থেকে, যাতে গ্রামীণ মানুষের চরম দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। চর্যাপদগুলোর সমাজচিত্রের ভেতর বাঙ্গালী-জীবনের সাংস্কৃতিক স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কাঁচা ও পোড়া মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি, মনসার পট তৈরি, কাঁথা সেলাই, হাড়ি-পাতিল চিত্রিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্প ও রুচির ধারণা পাওয়া যায়। 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থেও প্রাচীন সমাজের পরিচয় আছে।

৪। বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি (পাল রাজত্ব থেকে তুর্কী বিজয়)

৪.১ আর্যপূর্ব বাংলাদেশে যেসব মানুষ বাস করত, তাদের মধ্যে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় ও নেগ্রিটো প্রধান। এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-গঠন ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের মানুষেরা গোত্রভুক্ত ছিল। ক্রমে একাধিক গোত্রের লোক সমতলভূমিতে চাষাবাদ করতে এসে ছোট ছোট কৌম সমাজ বা জনপদ গঠন করে। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে কৌম সমাজ ও জনপদের যে নাম পাওয়া যায়, তা হচ্ছে— বঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট, হরিকেল। শক্তিশালী কৌমপতির অধীনে একাধিক কৌমরাষ্ট্র মিলিত হয়ে বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন কৌমপতি রাষ্ট্রপতিতে পরিণত হন। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে এবং কৃষিজাত পণ্যনির্ভর কুটিরশিল্পে তখনকার আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। এ সময়ের বিকাশমান সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় শাসক ও শোষিত শ্রেণীর চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী আবর্তিত হয়েছিল। সামন্ত-সমাজে ব্যক্তির অধিকার ছিল না। ধর্ম তখন একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজা বা পুরোহিত শ্রেণী ছিল সকল বিষয়-আশয়ের পরিনিয়ন্তা।

৪.২ আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। পাল বংশ চারশ' বছর রাজত্ব

করেছিল। পাল রাজাদের হাতে বাঙ্গালী প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং এ সময় থেকে বাংলায় সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে ঐসময় থেকে এদেশের মানুষ উদ্দীপ্ত হয়। পাল রাজাদের আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদণ্ডপুরী ও সারনাথের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলো আশ্রয় করে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে বাংলাদেশ গৌরবজনক আসন লাভ করে। বাংলার ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে চিহ্ন রয়েছে, তা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের আদি উৎস। উল্লেখ্য যে, পাহাড়পুর ও ময়নামতির স্থাপত্য শিল্পে লৌকিক জীবনধারার পরিচিতি বিধৃত।

৪.৩ সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা বিস্তৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্তশ্রেণী বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত কিংবা রূপান্তরিত করে ফেলে। ফলে পাল যুগের অবসানে বাংলার জনসমাজে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীভেদ, বর্ণবাদী শ্রেণীভেদে পরিবর্তন লাভ করে। সেন আমলে এক পরাক্রান্ত ও দুর্নীতিপূর্ণ সামন্ততন্ত্র তৎকালীন সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছিল। মানবিক সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তখন পূর্বের পরমতসহিষ্ণুতার বিলুপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

৫। মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (মুসলিম আমল)

৫.১ প্রাক্‌-মুসলিম যুগের পূর্ব-ভারতে কোন অখণ্ড আঞ্চলিক সত্তার বিকাশ ঘটেনি। তবে ঐ সময়ে বাঙ্গালী লোকগোষ্ঠী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো ক্রমাগত রূপ পাচ্ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি দিল্লীর রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে বাংলাকে মুক্তি প্রদান ও পূর্ব-ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ইলিয়াসশাহ, হোসেনশাহ প্রমুখ সুলতানগণ স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নিজেদের স্থায়ী করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। তৎকালে রাজস্বের উৎস নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দু ভূস্বামীদের সাহায্যে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করেন। বাংলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্তের জন্ম তখনও হয়নি। মুসলমানরা নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সমান্তরাল জীবনযাপন করত।

৫.২ মুসলমানদের আগমনের ফলে মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে মানবিক মূল্যবোধের নতুন ধারা সঞ্চারিত হয়। মুসলমান শাসকেরা এদেশে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন পশ্চিম থেকে আগত পীর, ফকির ও দরবেশবৃন্দ। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদে নিমজ্জিত, বর্ণবাদে জর্জরিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সাম্যবাদের বাণী ও মানবিক মূল্যবোধ এক নতুন জীবনাচরণের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। মুসলিম শাসকগণ সামন্ত-প্রভুদের মত সর্বদা অবিবেচক ছিলেন না। তাঁরা মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে রাজ্য শাসন করতেন। এই নতুন মানবতাবাদ শুধু মুসলিম সমাজে নয়, হিন্দু সমাজেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের ভাব-বিহ্বলতায় ভেসে গিয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' এই

মর্মবাণী প্রকাশের মধ্য দিয়ে চণ্ডীদাস এদেশে মানবিক সম্পর্ক, মানবিকতা, মানবতা ও মানবাধিকারের এক সম্মিলিত জয়গান উচ্চারণ করেছিলেন। ধর্ম নয়, রাষ্ট্র নয়, একমাত্র মানুষই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গৌরব ও মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের সংস্কৃতিতে মানবিক সম্পর্কের ফল্গুধারায় স্নাত হয়েছিল সেই সত্য।

৫.৩ মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটে। রামায়ণ–মহাভারতের অনুবাদ ছাড়াও মঙ্গলকাব্য, বৃহৎ পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হল মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যাবলী, যাতে দেবতাকে অতিক্রম করে মানুষ সৃজনশীল সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে। চৈতন্যচরিতামৃত, পাঁচালী, ময়মনসিংহ গীতিকা, গাজীর গান, মনসার ভাসান এসময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

৫.৪ মুসলমানদের এদেশে আগমনের পর ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি হল। তবে তা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে উদারনৈতিক ভাবধারা এবং পাল আমলের সহনশীলতাকে পুনরুদ্ধার করল। সুলতানদের উদারতা ও নিরপেক্ষতার জন্যই মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেব–প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। মধ্যযুগে মানবধর্ম তথা মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশই ছিল সংস্কৃতিচর্চার মূল কথা।

৬। আধুনিককালে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ইংরেজ আমল)

৬.১ বাংলার ভাগ্যাকাশে বিদেশীদের মধ্যে পর্তুগীজ বণিকেরা উদিত হয়েছিল সবার প্রারম্ভে। পরবর্তী সময়ে একে একে এলো ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ। ইংরেজদের বাণিজ্যের অধিকার শাসনের অধিকারে গিয়ে পৌছল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "বণিকের মানদন্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"। হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে নতুন প্রভুর বন্দনায় আত্মনিয়োগ করলো আর পরাজিত মুসলমান অবক্ষয়িত সমাজ জীবনে অন্তরভরা ইংরেজ–বিদ্বেষ নিয়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করতে চাইল।

৬.২ নতুন রাষ্ট্রীয় শক্তির আবির্ভাবে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বদাই একটা আকস্মিক চাপের সৃষ্টি হয়। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টির সহায়তায় এদেশে নতুন অভিজাত সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর গদ্য–সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম প্রমুখ পণ্ডিত। অভিজাত হিন্দু পরিবারের সন্তানরা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর রাজভাষা ফারসি ত্যাগ করে নতুন রাজভাষা ইংরেজির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

৬.৩ ইংরেজদের আগমনে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাগ্য–বিপর্যয় ঘটে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ভীষণভাবে মার খায়। হান্টার সাহেব ১৮৭১ সনে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে বলেছেন, "A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born

Musalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich".[৫]

৬.৪ ইংরেজরা বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তার করার পর অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পর থেকে এদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলায় নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। এদের ঘিরে বাবু কালচার জন্মলাভ করে। সাতশ' বছরের প্রচলিত ফারসি ভাষার স্থানে ইংরেজি রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বৈষম্য চরমরূপ লাভ করে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলার সংস্কৃতির ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করলেও তা সর্বত্র নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি, বাংলার জনজীবনকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

৬.৫ ইংরেজ দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলিম অভিজাততন্ত্রের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তার পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলমানরা পাশ্চাত্যভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল, আর অন্য দিকে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিল পেশাজীবী নগরনিবাসী মধ্যবিত্ত রূপে। ভাষার প্রশ্নে বিভ্রান্ত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ সেকালে ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। এতে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে মার খায়।

৬.৬ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমন্বয় করে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে হিন্দু সমাজের একাংশকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। ঐ সময়ে মুসলমানরা ওহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের এসব আন্দোলন শুধু সংস্কার-মুখাপেক্ষী ছিল না, বৃহত্তর দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণে তা রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তির আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার খাতিরে এ ধরনের আন্দোলন যথাযথ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে মুসলমানদের জীবনে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, হান্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে তা বিধৃত হয়েছে।

৭। সংস্কৃতির সংকট ঃ পাকিস্তানী আমল

৭.১ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই এদেশের মানুষের সত্তা দ্বৈত টানাপোড়নে আবর্তিত হতে থাকে। আমরা মুসলমান না বাঙ্গালী, এই অবান্তর প্রশ্নে জাতিসত্তাকে খন্ডিত করার প্রয়াস চলে। পাকিস্তানী ভাবধারাকে প্রথম থেকেই এদেশীয় মূল্যবোধের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মুসলমানদের নবজাগ্রত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের জোয়ারে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক সত্তা প্রায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। তারা ইসলাম ও

---

(৫) W. W. Hunter, 'The Imdian Musalmans', Published by W. Rahman, Bangladesh First Edition, June 1975. P-141.

জাতীয় সংহতির নামে বাঙ্গালীদের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এদেশে তাদের তল্পিবাহকের অভাব কোনদিন হয়নি। তারা আরবি হরফে, রোমান হরফে কিংবা আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা লেখায় উদ্যোগী হল। মূলত বাংলাভাষার ওপর আঘাত হেনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানকে তাবেদার ভূখণ্ডে পরিণত করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

৭.২ বাংলাভাষাকে বিকৃত করার প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানী সংস্কৃতির এদেশীয় ধারকবাহকদের মধ্যে। মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায় বাংলাভাষা সম্পর্কে তৎকালে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, তার নমুনাঃ "গোজাস্তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাঙলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াবিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাঙলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহ্‌দের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকাত হাসিল করেছিল। ... সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাঙলা ভাষা মাশরেকি পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয়, এবং হবে না, হতে পারে না। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী[৬]।"

৭.৩ সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করা হলেও, ততদিনে প্রগতিশীল ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা আত্মআবিষ্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজতে গিয়ে তারা অসাম্প্রদায়িক দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যে লালিত হাজার বছরের আবহমান বাংলার জীবনায়নে নিজেদের প্রতিকৃতি দেখতে পায়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সরকারি সাহিত্য সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘোষণা করেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তারচেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো'টি নেই।"[৭]

৭.৪ ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে খুব বেশি দেরি হয়নি। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই একটি সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামন্তবাদী ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রতিহত করা হল ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে। ভাষা, তথা সংস্কৃতির জন্য রক্ত দান পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পরবর্তী সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারির অমর আত্মদানকে সামনে রেখে এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশমান হয়।

---

[৬] সুকান্ত একাডেমী, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি'-উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৪।

[৭] পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

৮। বাংলাদেশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর

৮.১ ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী, মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে জাগ্রত হয়। সাংস্কৃতিক আত্মানুসন্ধিৎসাই ধাপে ধাপে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরিণতি লাভ করে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার গৌরবপূর্ণ দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না।

৮.২ কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপান্তর আজও কোন স্থিতি লাভ করেনি। ১৯৭৫ সনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন সংকট সূচিত হয়। ঐ সময়ের পর বিগত ২০ বছরেও এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে বিঘোষিত হয়নি। সত্যি বলতে কি, আজ আমরা এক নতুন সাংস্কৃতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছি, যা নতুন প্রজন্মকে বহুধাবিভক্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

৯. উপসংহার ঃ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

৯.১ কোন রাষ্ট্র জনগণের চিন্তা ও চেতনার মৌলিক অভিব্যক্তিগুলো ধারণ করে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে জাতিসত্তার সুস্পষ্ট বিকাশ বাঞ্ছনীয়। জাতির মৌল নীতিতে নিজস্ব সত্তাকে বিভক্ত করা হলে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিতর্কিত হলে তাতে একসময়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে উঠতে পারে। পাকিস্তানের পরিণতি আমাদের সামনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৯.২ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের করাত দিয়ে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করলে সাংস্কৃতিক স্ববিরোধিতা আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী আমলের মত দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হলে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা পথ হারিয়ে ফেলব।

৯.৩ কোন জাতির পরিচয় চিরকাল এক জায়গায় থেমে থাকে না। তা সর্বদাই বিকাশমান। সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচর্যা সেই পরিচয়ের সুস্থ বিকাশকে সহায়তা করে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির বর্তমান সীমাবদ্ধতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। তবে যতদিন আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মধারা শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অঙ্গনে বাঁধা থাকবে, ততদিন আমাদের আত্মপরিচয় থাকবে খণ্ডিত[৮]। সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে পারলে এদেশের মানুষের আত্মপরিচিতির সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক চেতনার মুক্তি।

---

(৮) কবীর চৌধুরী 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সংকট' সুন্দরম, অগ্রহায়ন – মাঘ, ১৩৯৪।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ইসলাম, ডক্টর সিরাজুল, সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস),' এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

২। ইসলাম , মুস্তাফা নূরউল, সম্পাদিত 'বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

৩। চৌধুরী, কবীর, 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সংকট' সুন্দরম, অগ্রহায়ন-মাঘ, ১৩৯৪।

৪। চৌধুরী ,মোতাহের হোসেন, 'সংস্কৃতি –কথা', সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৫।

৫। মুসা , মনসুর, সম্পাদিত 'বাঙলাদেশ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।

৬। রহিম, ডক্টর মুহম্মদ আবদুর, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৭। রায়, শিবনারায়ণ , 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,' দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১।

৮। শরীফ, আহমদ, 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা', আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯১।

৯। সুকান্ত একাডেমী, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি', মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৫।

১০। হালদার, গোপাল , 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', মুক্তধারা, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৭৫।

১১। Hunter, W. W. 'The Indian Musalmans', Published by W. Rahman, Bangladesh First Edition, 1975.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহ

গোলাম মোস্তাকীম*

১.০ ভূমিকা

১.১ কবি বলেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এটা একটা সর্বজনীন বাণী। আমরা যদি এ কথাটা মনে রাখি এবং মেনে চলার চেষ্টা করি; তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু নানা কারণে আমরা কথাটা ভুলে যাই। ফলে মানবতা ও মনুষত্বের অবমাননা ঘটে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের চতুর্দিকের মানবগোষ্ঠীকে পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ বেদনার কথা আমাদের জানতে হবে, ভাবতে হবে এবং সম্ভব হলে তার প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

১.১ ফরাসি ভাষায় একটি কথা আছে। কথাটির অর্থ হল, 'সব বুঝতে পারলেই সব ক্ষমা করা যায়।' বক্ষমান প্রবন্ধে আমাদের বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

২.০ ক্ষুদ্র জাতি

২.১ আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত গোত্রের লোকজন দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। সকল সম্প্রদায় ও জাতিই নিজ নিজ মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এছাড়াও আমাদের দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন উপজাতি তথা ক্ষুদ্র জাতিসমূহ রয়েছে। বর্তমান পার্বত্য জেলাসমূহের প্রাকৃতিক নিসর্গে বসবাস করছেন চাকমা, তংচঙ্গ্যা, মগ, কুকি, লুসাই মুরং, টিপরা, সেন্দুজ, পাঙ্খো, বনযোগী ও খুমিরা। কক্সবাজারের মগ, সিলেটের মনিপুরী ও খাসিয়া, ময়মনসিংহের গারো ও হাজং, রংপুর-রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার ওরাওঁ, সাঁওতাল ও রাজবংশীদের কথাও উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকজনই বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা ও বন-জঙ্গলে বসবাস করে থাকে। আমাদের থেকে একটু দূরে বাস করলেও তারা সবাই আমাদের দেশেরই নাগরিক। তাদের সুখ-দুঃখ এবং আমাদের হাসি-বেদনার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এ সকল জনগোষ্ঠীর অনেকে নিরক্ষর হলেও তারা অশিক্ষিত

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(uncultured) নয়। তাদের সবারই রয়েছে নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের সরল জীবনযাত্রা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

২.২ বর্তমানের ৩টি পার্বত্য জেলাকে কিছুদিন আগেও পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে অভিহিত করা হত। এই এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ এবং তাদের মধ্যে হিন্দুদের পারিবারিক প্রভাব বেশ দেখা যায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ এলাকার লোক সংখ্যার বিভাজন ছিল নিম্নরূপঃ

সমগ্র লোক সংখ্যার পরিমাণ	২৮৭,৬৮৮
ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাভুক্ত লোকজন	২৬১,৫৩৮
বাঙ্গালী	২৬,১৫০

এদের মধ্যে পাহাড়ি লোকজনের বিভাজন নিম্নরূপঃ

বন	৯৭৭
চাকমা	১২৪৭৬২
খিয়াং	১৩০০
খুমি	১৯৫১
কুকি	১৯৭২
লুসাই	১৩৬৯
মগ	৬৫৮৮৯
মুরং (মুরো)	১৬১২১
পাঙ্খো	৬২৭
রিয়া	১০১১
তংচঙ্গ্যা	৮৩১৩
টিপরা	৩৭,২৪৬

(পিয়ের বেসিনাঁ, ১৯৫৮, পৃঃ ৪)

২.৩ উপরের ১১টি দলের মধ্যে ৫টি দল; যথা চাকমা, মগ, মুরং, টিপরা ও তংচঙ্গ্যাদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী। এ এলাকার লোকজনের চালচলনে সমতল ভূমির লোকদের থেকে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.০ চাকমা

৩.১ মগ ও চাকমারা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। টিপরারা হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে থাকে। অন্যান্যরা নিজেদেরকে বুদ্ধের অনুসারী বললেও তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক আচার-আচরণে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ কর্ণেল ফেইরী মনে করেন যে চাকমারা মিয়ানমার থেকে তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে এসেছে।

৩.৩ পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষুদ্র জাতির অধিবাসীরা যে এখানকার ভূমিজ সন্তান নয় এবং তারা যে বাইরে থেকে এখানে এসেছে তা নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ গবেষণা করে জানিয়েছেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে চাকমারা বর্তমান অবস্থায়

এসেছে এবং তাদের ধর্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের অনেক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য মিশে গিয়েছে।

৩.৪ স্যার রিজলী মনে করেন যে, ব্রহ্মভাষার "সাক" বা সেক জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি এবং তারা একসময় আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামাবতী নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে খুব প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ ন্যাসিং ন্যা থৈন ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তখন পশ্চিম দেশের অনেক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য তথায় আগমন করে এবং পরে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা সাক বা সেক নামে অভিহিত হত। অনেকে মনে করেন এসব সাক বা সেক শব্দ ইসলামী 'শায়খে'র অপভ্রংশ।

৩.৫ মগরা মনে করে যে পরাজিত মোগল সৈন্যদের ঔরসে ও আরাকানী মেয়েদের গর্ভে যে জাতির উদ্ভব হয়েছিল তারাই সাক বা সেক। কিন্তু চাকমারা স্বয়ং এসব বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে, মগভাষায় 'শাক্য' অর্থ সাক' এবং যারা রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বলা হয় সাকমাং (মাং রাজা অর্থে) 'চাকমা' শব্দ এসেছে এই 'সাকমাং' থেকে। চাকমারা এই বিশেষ কথাটির ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তাদের এ নিজস্ব মতামত এবং মগদের এ ভাষাগত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা প্রমাণ করতে চায় যে, তারা শাক্যবংশসম্ভূত মহামুনি বুদ্ধের বংশধর।

৩.৬ চাকমা সমাজে অনেক ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। 'বিষু' 'ওয়াছ', 'ওয়াগ্যা' এবং 'মাঘী পূর্ণিমা' ইত্যাদি সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান। বিষু বা মহাবিষুর সংক্রান্তি চাকমা ও মগ সমাজে প্রধান ও পবিত্র পর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। বসন্তের শুরুতে চৈত্রমাসে এ পর্বের অনুষ্ঠান হয়। মহামুনি বুদ্ধের মূর্তি যে মন্দিরে স্থাপিত হয় তাকে 'ক্যাং' বলে এবং সেখানেই এ পর্বের আয়োজন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য পর্ব হিন্দুধর্মের অনুসরণে অনুষ্ঠিত হয়। দান-দক্ষিণা, ধর্মকথা শ্রবণ এবং ভিক্ষু খাওয়ানো এদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অবশ্য করণীয় কর্ম।

৩.৮ চাকমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত আটাশটি প্রধান ঃ

১। আগর তারা ২। সবধিবর্ংগিরি তারা ৩। আনিজা তারা ৪। আরেন তামা তারা ৫। সিগল মোগল তারা ৬। সরকদান তারা ৭। দাসা পারামি তারা ৮। বড় কুরুক তারা ৯। ছোট কুরুক তারা ১০। স্ত্রী পদুরা তারা ১১। সুরাদিজা তারা ১২। পুদম্ ফুলু তারা ১৩। ফুদুম্ ফুলু তারা ১৪। সাহস ফুলু তারা ১৫। চেরাক ফুলু তারা ১৬। স্বামী ফুলু তারা ১৭। রাখেম্ ফুলু তারা ১৮। মালেম তারা ১৯। ত্রিকুন্দ তারা ২০। তান্ত্রিক শাস্ত্র তারা ২১। জিয়ন ধারণ তারা ২২। সবা দিবা তারা ২৩। বুদ্ধ ফুলু তারা ২৪। আজিনা তারা ২৫। সাক সুক্তন তারা ২৬। শাক্য তারা ২৭। ফকিরি তারা ২৮। আঙারা সূত্র তারা।

৩.৯ পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত চাকমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও আমরা নীতিকথা ও উপদেশবাণীর সমাবেশ দেখতে পাই। কিন্তু অনুবাদ ও প্রচারের অভাবে আমরা অনেকেই চাকমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে অবহিত নই।

৩.১০ ধর্মগ্রন্থগুলো বিভিন্ন পূজায় ভিক্ষু বা রড়ি কর্তৃক পঠিত হয়ে থাকে। ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে মাথা ধোয়া পর্বে 'বড় কুরুক তারা' ও 'ছোট কুরুক তারা' রাজা বা সম্মানী ব্যক্তির বিয়েতে 'সিগল মোগল তারা,' জাদি বা ধর্মপূজায় 'মালেম তারা', 'দাসা পারামি তারা' ও 'সাহস ফুলু তারা' মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ড দিতে 'আনিজা তারা' রাজা বা সম্মানী ব্যক্তির মৃত্যুকালে 'আরেন্ তামা তারা' শ্মশানে দাহনক্রিয়া সম্পাদনের সময় 'সাধ্বিংগিরি তারা', বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে 'রাখেম ফুলু তারা' ভাদ্যা অনুষ্ঠানে ও পিন্ডদান পর্বে 'জিয়ন ধারণ তারা', 'সবা দিবা তারা', 'চেরাগ ফুলু তারা', 'বুদ্ধফুলু তারা', এবং 'সানেং ফুলু তারা', 'অগ্নির ভয় থেকে রক্ষাকল্পে 'সাক সুক্তন তারা', রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য 'তান্ত্রিক শাস্ত্র তারা', নীতিতে আহরণের জন্য 'ফকিরি তারা' পঠিত ও ব্যবহৃত হয়। এসব ছাড়া বাকি গ্রন্থগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা শুনবার জন্য পবিত্রজ্ঞান করা হয়। এমনকি চাকমা কবি শিবচরণ রচিত সাত পর্বে সমাপ্ত 'গোজেনের লামা' (ঈশ্বরের প্রশংসাগীতি) নামক গীতিকাব্যখানিও চাকমা সমাজে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। (আবদুস সাত্তার, পৃঃ ৩৯)।

৩.১১ প্রায় দেড়শত গোষ্ঠী নিয়ে চাকমা সমাজ গঠিত এবং গোষ্ঠীগুলোর কর্তব্য হল পরস্পরকে সাহায্য করা–পরস্পরের বিপদে এসে সম্মুখে দাঁড়ানো। এ প্রসঙ্গে স্যার রিজলী বলেছেন, "Among the Chakmas, as perhaps, among the Greeks and Romans in the begining of their history, the sect is the unit of the tribal organisation for certain public purposes."

৩.১২ চাকমাদের সমাজে ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল এবং হিন্দু ধর্মের মত কঠোর শ্রেণী বিভাগ তাদের সমাজে নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.১৩ চাকমা সমাজে বিয়েতে বেশ আনন্দ উৎসব করা হয়। এ সমাজে বৈধ ও অবৈধ বিয়ের ব্যাপারে কঠোর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তালাকের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে তালাক ব্যবস্থা হেডম্যান ও দশজন গ্রামীণ মাতব্বরের বিচারে নির্ণয় করা হয়।

৩.১৪ চাকমারা জীবিকার্জনের জন্য সাধারণত 'জুম' চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পাহাড়ের ঢালুর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এ চাষ করা হত। একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ বপন করা হত এবং পর্যায়ক্রমে ফসল তুলে নেয়া হত। চাকমারাও সমতল ভূমির বাঙ্গালীদের মত চাষাবাদে বর্তমানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

৩.১৫ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় পাবর্ত্য জেলাগুলোতে লোকসংখ্যা খুবই কম। নিচে ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৫০ বছরের লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দেখানো হল ঃ

আদমশুমারি	১৯০১	১৯৫১
খৃষ্টান	–	৩৭৫৫
চাকমা	৪৪,৩২৭	২,১৫,০০০
মগ	৩৪,৭০৬	
টিপরা	২৩,৩৪'	
হিন্দু	৩,৮৫৬	৩৪,২৫৪
কুকি	২,১৪৭	
খুমি		১৬,২০৫
মুরং	১০,৫৪০	
পাঙ্খোকনগোষ্ঠী	৯৩৭	
মুসলমান	৪,৯০৬	১৮,০৭০
মোট	১,২৪,৭৬০	২,৮৭,২৭৪

(আবদুস্ সাত্তার পৃঃ ৬৩)

৩.১৬ চাকমাসমাজের সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এবং পুষ্টি লাভ করেছে। চাকমা সমাজে অনেক প্রবাদ, ছড়া, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, উপকথা, বারমাসী শোকগাঁথা, প্রেমসঙ্গীত ও ভাবসঙ্গীত প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে এসকল বিষয়াবলী এক অনন্য স্থান দখল করে আছে।

৪.০ তংচঙ্গ্যা

৪.১ তংচঙ্গ্যাদেরকে চাকমাদের অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের পূর্ব পুরুষ আরাকান প্রদেশে বসবাস করতেন। তাদের উদ্ভব নিয়ে বেশ কয়েক ধরনের মতবাদ আছে। তবে তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের নানা রকম সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে জড়োপাসনার লক্ষণ দেখা যায়। এর ফলশ্রুতিতে তারা চাকমাদের জাতীয় দেবদেবী ছাড়াও বৃক্ষ, ঝর্ণা, পাথর, পাহাড়পর্বত, নদীনালা ইত্যাদিকে দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের ধর্ম বেশ সরল। এটাকে প্রকৃতির ধর্ম বলা চলে। তারা মনে করে প্রকৃতির মাঝেই এক ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করে আছে।

৪.২ তংচঙ্গ্যারা সাধারণত ভদ্রতা নম্রতার ধার ধারে না। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ বা অন্তর্বিবাহের মত কোন ঝামেলা নেই। কারণ তারা মামাতো বোন ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারেনা। বিয়ের সময় পাত্রকে দা, অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দান করার বিধান রয়েছে। এছাড়া আবশ্যিকভাবে ছেলেকে এক হাজার ডিম দিতে হয়।

৪.৩ তংচঙ্গ্যারা সাধারণত জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভাত ও মাছ এদের প্রধান খাদ্য। সাংসারিক ও ধর্মীয় যে কোন অনুষ্ঠানে মদ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫.০ মগ

৫.১খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ,বান্দরবান পার্বত্য জেলা, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর কলাপাড়া থানায় মগরা বসবাস করে থাকে, পটুয়াখালীর মগরা ১৭৮৯ সালে আরাকান থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাস করতে আসে।

৫.২ এক সময় মগদের অত্যাচারে সারা বাংলাদেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এমনকি সুদূর ঢাকায়ও মগদের অত্যাচারের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। মগবাজার এলাকা তার একটি চিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলার সুবাদার, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা সুন্দর বন এলাকার মগদের দমন করার জন্য পটুয়াখালী জেলার সুজাবাদ গ্রামে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। সে দূর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

৫.৩ মগ বলতে যে আরাকানী জলদস্যু বোঝায় এটা মানতে শিক্ষিত মগরা রাজি নন। এখনও আমরা বলে থাকি "এটা কি মগের মুল্লুক"? মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা মনে করেন গৌতমবুদ্ধের জন্মভূমি মগধ থেকে মগ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

৫.৪ প্রখ্যাত ভষাতত্ত্ববিদ ডক্টর গ্রীয়ারসন মন্তব্য করেন যে, "মগ কথাটি ইন্দোচীনভাষায় জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মগরা আসলে ইন্দোচীন জাতির অন্তর্ভুক্ত।"

৫.৫ মগ বলতে অত্যাচারী বোঝায় বলে ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে মগরা নিজেদেরকে মগের পরিবর্তে 'মার্মা' নামে অভিহিত করতে অনুরোধ করে। এ কারণে মগদের অঞ্চলকে মার্মা অঞ্চল বলা হয়।

৫.৬ শিক্ষিত মগরা বৌদ্ধ ধর্মের আচারগুলো মেনে থাকে। তবে অশিক্ষিত মগদের ধর্মাচরণের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অমিল দেখা যায়। প্রত্যেক পূর্ণিমাকে বৌদ্ধ ধর্মে অতি পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে 'তাবুং লাব্রে' বলা হয় এবং মগদের নিকট এই মাঘী পূর্ণিমা অতি পবিত্র। কারণ তারা মনে করে এ সময়ে বুদ্ধদেব ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। 'থিজিয়ানা' নামে মগদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের পুরোহিতদের মত রড়ি দ্বারা মগদের পূজাপার্বণ পরিচালিত হয়। 'থাদুক্কুং' মগদের ধর্মগ্রন্থ।

৫.৭ এদের মধ্যেও গোত্র-বিভাগ রয়েছে। অনেক অনুসন্ধান করে আমরা পনেরোটি গোত্রের সন্ধান যেমন রিগ্রাইস্তা, পালেঙগস্তা, পালেংগীস্তা, কাউক দিনস্তা, ভেইর্মেনস্তা, সারুংগস্তা, ফারমে প্রোস্তা, স্মিউকাপিআস্তা,ছেড়েংগস্তা, মারুতস্তা, সাবোক্সস্তা, ক্রংখিয়াংস্তা, তৈঅংসিয়ট, থিয়মস্তে, ও মাহলংস্তা। এ সব গোত্রের সবাই পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের নামের সঙ্গে পরিচিত এবং সে বাসস্থান নদী-তীরবর্তী অঞ্চল (খিংথা) কিংবা পর্বতসংকুল গহীন অরণ্যভূমি টংথা। (আবদুস সাত্তার, পৃঃ ১৩৩)

৫.৮ মগদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তবে মজার ব্যাপার হল যে, চাষাবাদ বা অন্যান্য অন্ন সংস্থানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ মেয়েরাই করে থাকে। মগ সমাজের পরিচিতি পুরুষপক্ষকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

৫.৯ মগসমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয় রীতিই প্রচলিত আছে। মগরা অপর জাতি থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে না তবে তাদের মেয়েরা স্বেচ্ছায় ভিন্ন জাতি থেকে স্বামী গ্রহণ করলে তার সামাজিক স্বীকৃতি পেতে অসুবিধে হয় না। মেয়েরাই সাধারণত বর নির্বাচন করে থাকে। তবে সমাজের উচ্চতম স্তরের বিয়ে সাধারণত বাবা-মা অথবা অভিভাবকদের মতানুসারেই হয়ে থাকে।

৫.১০ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির লোকদের মত মগরাও জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে এরা সমতলের বাঙ্গালীদের মত চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহিলারা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মগ পুরুষদের অনেক সময় অলসভাবে জীবন-যাপন করতে দেখা গেলেও মগ মেয়েরা কখনই তা করে না। চাষাবাদ ছাড়াও মগ মেয়েরা কাপড় বুনন ও চুরুট তৈরী করে থাকে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা এসব বাইরে রফতানি করে থাকে।

৬.০ কুকি

৬.১ কুকিরা এক সময় পার্বত্য ত্রিপুরা, আসাম ও লুসাই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। ১৮৬০ সালের পরে তারা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চলে আসে। গভীর অরণ্যে চলাফেরার সময় কুকিরা তাদের দলচ্যুত সঙ্গীদেরকে 'কু' শব্দে আহ্বান করে এবং প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষ 'কি' শব্দে উত্তর দেয়। এ কারণে তারা সমতলভূমির অধিবাসীদের দ্বারা সম্ভবত 'কুকি' নামে অভিহিত হয়েছে। ১৯০১ সালের আদমশুমারির বিবরণীতে দেখা যায় যে "কুকি শব্দটি সত্যি সমতলভূমির অধিবাসীদের প্রদত্ত এবং এতে তারা টিপরা, চাকমা ব্যতীত অন্যান্য পাহাড়ী জাতিদেরকেই বোঝাতে চায়"।

৬.২ পুরানো কুকি ও নতুন কুকি এ দুই শ্রেণীতে কুকিরা বিভক্ত। নতুন কুকিরা 'থেতু' নামে পরিচিত। ধর্মীয় আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থায় এ দুই শ্রেণীর কুকিদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা একে অপরের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। এ কারণে তাদের সমাজ সংহতির মধ্যে বেশ দৃঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৩ কুকিদের মধ্যে আইমোল, অনল, চউতে, চিরু, কোহেলন, কোম, লামাং, পুরুম, টিকুপ ও ভইফেই নামে মোট ১০টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে।

৬.৪ কুকিরা পাথিয়ান নামক এক দেবতায় বিশ্বাস করে যিনি আকাশে অবস্থান করেন এবং তাঁর আদেশেই বিশ্ব-ভুমন্ডল, গাছবৃক্ষ, জীবজন্তুসহ অন্যান্য সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। জুলাই মাসে পামিয়ান দেবতার পূজা হয়। এ পূজা চা-পুই চোল্‌লাই নামে অভিহিত। পূজার দিনে দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর উৎসর্গ করা হয় এবং প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে মোরগ হত্যার আয়োজন করা হয়। পূজাতে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাথিয়ান দেবতা ছাড়াও কুকিরা অসংখ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টির সব কিছুই কোন না কোন দেব-দেবী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এসবের মধ্যে তাদের প্রভাব রয়েছে। এ কারণে এসব বস্তুকেও কুকিরা দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করে থাকে।

৬.৫ কুকিরা পরকালে বিশ্বাস করে না। তবে মৃত্যুর পরে সকল আত্মাকে এক অলৌকিক শক্তি নিয়ে যায় এবং আত্মারা 'মিথুখু' নামে একটি স্থানে অবস্থান করে। কুকিরা মনে করে এ স্থানটি গহীন অরণ্যে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।

৬.৬ কুকিরা নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রেমের কারণে কোন কুকি মেয়ে বাইরে বিয়ে করতে চাইলে সমাজ তাতে কোন আপত্তি করে না। কুকি সমাজে বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষকে যৌতুক হিসেবে গয়াল, দা, বন্দুক, বল্লম, ছাগল, ইত্যাদি দিতে হয়। অনেক সময় এসব জিনিসের পরিবর্তে সমমূল্যের কাজ করে দেয়ার বিধান রয়েছে।

৬.৭ কুকিরা তাদের মৃত দেহকে কবর দেয়। কবর দেয়ার পূর্বে মৃত দেহের সম্মুখে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ছাড়াও ধর্মযাজক বা মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনা করে নানা রকম মন্ত্র পাঠ করে এবং ইহজীবনের সঙ্গে যে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পর্ক শেষ হল তাও বলা হয়।

৬.৮ কুকিরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণ করে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর সর্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে। মাঝের ছেলেরা অন্য দু ভাইয়ের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

৬.৯ সাহিত্য একটি সমাজের দর্পণ। কুকি সাহিত্য অজস্র পূরা কাহিনী, কথা, উপ-কথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোকগীতি, প্রবাদ, সৃষ্টিতত্ব কাহিনী, আদি মানব-মানবীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী, বাঘ-যাদু ইত্যাদিতে ভরপুর। অন্যদিকে কুকি লোক-গীতিগুলোর সাহিত্যমূল্যও বেশ উচ্চ স্তরের। নিচে একটি কুকি গানের উল্লেখ করা হল ঃ

তোমার ও রূপে যেন রূপ খেলা করে,
সুডৌল মুখের বৃন্তে ফুল ফুটে আছে।
তোমাকে পাবার আশা হৃদয়ে আমার,
অথচ তোমার মন চায়না আমাকে।
আমাকে দাও না এসে তোমার ঢোলক,
ঢোলক বাজাব আমি তব চার পাশে।
তুমি তো রূপসী মেয়ে, তোমার ও রূপ
আমাকে এনেছে টেনে তোমার উঠোনে।
জানি না পাবো কি আমি তোমার পরশ?
অথচ এখন কেন তোমাকে যে চায়।
কঠিন পাথর তুমি। আমার এ প্রেম।
সেখানে আঘাত খেয়ে শুধু ফিরে আসে (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১)

৭.০ লুসাই

৭.১ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সাজেক অঞ্চলে লুসাইরা বসবাস করে থাকে। ১৮৭১ সালের পর লুসাই পার্বত্য এলাকা থেকে তারা এখানে আসে বলে তাদেরকে লুসাই বলা হয়। আবার ক্যাপ্টেন হার্বাট লুই মনে করেন, লুসাই ভাষায় 'লু' (মাথা) এবং 'সাই'

(কর্তন) অর্থাৎ যারা মাথা কাটে তাদেরকে লুসাই বলে। সাজেক অঞ্চলের নিকটে রূপ লুই, লেংকর, কাংলাক, শিয়ালদুলুই, তুইকুই, তলেসপুরই মৌজায় এদের সংখ্যা অত্যধিক।

৭.২ লুসাইদেরকে এককালে খুবই হিংস্র মনে করা হত। কিন্তু একথা মানতে তারা রাজী নয়। এরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ঃ থাংগুর, পাচুয়াও, চাংতে, চুংতে চুআ চাং চুআওংগু, হাউনাব, হারশেল, হুয়ালহাং, লুংগথুআ, তৃনুং, তাংসুং। এই মূল গোত্রগুলো আবার বিভিন্ন সহগোত্রে বিভিক্ত।

৭.৩ লুসাইরা জড়োপাসনা বা প্রেতপূজা (Animism) করে থাকে। তাদের বিশ্বাস 'পাথিয়ান' নামে একজন দেবতা এ বিশ্ব ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং কখনও কারও অমঙ্গল কামনা করেন না। তবে ব্যাধি-অমঙ্গল সব কিছুই আসে লুয়াই নামে কিছু দৈত্যদানব থেকে, যাদেরকেও তারা দেবতা বলে বিশ্বাস করে। এছাড়া খোয়াবং, মিভেংগতু, সাধু-আ, তুইহুয়াই ও রামহুয়াই নামে আরও কিছু দেবদেবীর পূজা তারা করে থাকে।

৭.৪ লুসাই সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত আছে। বিয়ের পূর্বেই এ পণ দিতে হয় এবং বরপক্ষ এ পণ দিয়ে থাকে। তারা একই গোত্রে (Endogamy) বিয়ে করাকে রীতি -বিরুদ্ধ মনে করে। তবে ভিন্ন গোত্রে বিয়ে (Exogamy) করতে কোন আপত্তি নেই। এদের সমাজে তালাক প্রথা প্রচলিত এবং তা গ্রামের উপা বা মাতব্বরদের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

৭.৫ লুসাইদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। পিতার মৃত্যুর পর শুধু কনিষ্ঠতম পুত্র সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। অন্যান্য ছেলেরা তার কৃপার পাত্র হয়ে থাকে। বিধবা মা পুনরায় বিয়ে করলে তার সম্পত্তি তার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করা হয়। কেও অপুত্রক হলে 'সাফুম' উৎসবের মাধ্যমে তার সম্পত্তির মালিকানা নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের হাতে সমর্পণ করা হয়।

৭.৬ লুসাইরা মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকে। কারণ তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর আর একটি জগৎ আছে এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মা মিথিখো-আ নামে গহীন অরণ্যের কোন স্থানে অবস্থান করে।

৮.০ মুরং

৮.১ বান্দরবন পার্বত্য জেলায় মুরংরা বসবাস করে থাকে। তারা পূর্বে আরাকানের অধিবাসী ছিল। খুমিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বর্তমান আবাসস্থলে অবস্থান গ্রহণ করে।

৮.২ মুরংরা শুধু ইহকালে বিশ্বাস করে। পরকালে তাদের কোন বিশ্বাস নেই। ইদানীং কিছু কিছু মুরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে নিজেদেরকে দাবি করলেও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তাদের পূজা-পার্বণের রীতিনীতির অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৮.৩ মুরং সমাজে যুবক-যুবতীদের মন দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে বিয়ে প্রচলিত থাকলেও পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের মতের গুরুত্ব দেয়া হয়। এরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিয়ে

করতে পারে তবে একই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বিয়েতে পণপ্রথা প্রচলিত আছে এবং তা কণে পক্ষকে দিতে হয়। এ পণের টাকা সাধারণত বিয়ের আনন্দ উৎসবে খরচ করা হয় এবং তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে।

৮.৪ মুরং সমাজে কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিত নেই। সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং বিয়ে পড়ানোর কাজ তারা নিজেরাই করে থাকে। এদের সমাজে তালাক প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে সমাজে তা নিন্দনীয় হিসেবে দেখা হয় এবং স্বামীকে একটি দা দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়। জীবজন্তুর মতই সমগ্র বনভূমি তার বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ লোকদের মাঝে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে, তবে সম্ভ্রান্ত বা রাজপরিবারে বিধবাদের বিয়ে দেয়া যায় না। মুরং সমাজে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার কোন নিয়ম নেই।

৮.৫ মুরং সমাজের অধিবাসীরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় অধিকতর কাজ করে এবং তারা বেশি কর্মঠ। সংসারের যাবতীয় কাজ মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি করে থাকে। জুম চাষেও বন থেকে কাঠ কাটার সময় মুরং মেয়েরা পুরুষদের সহায়তা করে থাকে। এছাড়া তারা হাটে বাজারে বেচাকেনার কাজ করে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে সর্বাধিক সম্পত্তি পায় বলে জীবিতাবস্থায় পিতা-মাতা কনিষ্ঠতম পুত্রের সঙ্গে সববাস করে। মেয়েপুরুষ উভয়েই কঠোর পরিশ্রম করে বলে মুরংরা সাধারণত আশি নব্বই বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং এদের মধ্যে অসুখ নেই বললেই চলে।

৯.০ টিপরা

৯.১ ষোড়শ শতাব্দীর পরে পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে টিপ্‌রারা বর্তমান তিনটি পার্বত্য জেলাতে চলে আসে। এরা এ তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে রামগড় এলাকাতেই তাদের বসবাস সবচেয়ে বেশি।

৯.২ টিপরারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করলেও পূজা পার্বণে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মীয় আচারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এদের মাঝে এখনও প্রাচীন পদ্ধতির ধারাগুলো খেয়াল করা যায়। টিপ্‌রা সমাজে এক প্রকারের বৈরাগীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের জন্য বিয়ে এবং সংসার ধর্ম পালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা শুধু সৎকর্ম করার অধিকারী এবং জীবিকার্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

৯.৩ টিপ্‌রা সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এসকল গোত্র পিতৃপ্রধান। মেয়েদের কোন প্রভাব নেই। বাইরের গোত্র থেকে এদের স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। একই গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এপ্রথা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের দু'বছর পর কণেকে বরের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে আনা হয়। সাধারণত টিপ্‌রাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না। তবে কোন পক্ষ যদি একান্তই বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছে প্রকাশ করে তবে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হয়। উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলেও বিয়ে বিচ্ছেদ হয় তবে সে ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়। প্রেমের কারণে এ সমাজে বিয়ের প্রচলন আছে। বিধবাদের বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

৯.৪ অন্যান্য পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতির মত টিপ্‌রারা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল এবং এ কাজে নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে সংসারযাত্রা নির্বাহে সহায়তার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম ঘনীভূত হয়।

৯.৫ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে প্রেমের মাধ্যমে টিপরা সমাজে বিয়ে হয়ে থাকে। সুমধুর গানের সুর দিয়ে যুবকরা যুবতীদের হৃদয় হরণের চেষ্টা করে। নিচে একটি প্রেম সঙ্গীত দেয়া হলঃ

হালাপ বারা অ থায়ে
ববার সিকলা কানলিয়া
বাথাই চেরাওক রাওক থুংলিআ।
লামানি বোর্কুংগ যায়তালাই
ববার সিকালা ক্যান খামো
বথায় চেরাওক রাওক থুংখামো।

অনুবাদ ঃ

কেন ফুল ফোটে এ বনের বাগানে?
এখানে আসে না কেও সে ফুল খোপায় গুঁজে নিতে
সে কথা কেও কভু জানে?
যে ফুটে না এ মনের বাগানে
যে ফুল জানে না হায় আমার প্রেমের কোনো মানে
কি লাভ সে ফুল দিয়ে, যে ফুল একাকী ঝরে যায়?
যদি বা ফুটতো ফুল আমার প্রিয়ার বাগিচায়,
তবে সে গুঁজতো ফুল কী উল্লাসে আপন খোঁপায়।(আবদুস্‌ সাত্তার, পৃঃ২২১)

১০.০ সেন্দুজ

১০.১ সেন্দুজদের আদি নিবাস ছিল চীন দেশের ব্লু মাউন্টেন অঞ্চল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর তারা তাদের বর্তমান আবাসস্থলে আছে। এরা গহীন অরণ্যেই থাকতে ভালবাসে এবং সাধরণত শহরে আসে না। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে সেন্দুজরা পাঙ্খো ও বনজোগীদের ভিন্ন শাখা মাত্র এবং ভাষাগত ব্যাপারেও তাদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১০.২ সেন্দুজরা প্রধান চারজন দেবতার উপাসনা করে থাকে। তাদের মতে পত্যেনই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং দিন শেষে সূর্য তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্য তিন জন দেবতা হলেন ঃ খোজিং, সুরপার ও ওয়ানচং। সেন্দুজরা পাথরকে খুব পবিত্র মনে করে।

১০.৩ যৌবনপ্রাপ্ত হলেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। প্রেমঘটিত বিয়ের রীতি সমাজে থাকলেও বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।

১০.৪ পূর্বে সেন্দুজরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা সমতলের অধিবাসীদের মতই চাষাবাদ করে। নারীপুরুষ উভয়েই এ কাজে আনন্দের সঙ্গে

অংশগ্রহণ করে থাকে। সাংসারিক কোন প্রয়োজনেই তারা অন্যের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করে না। এমন কি গভীর বনের এক ধরনের মাটি থেকে তারা লবণ তৈরী করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়।

১১.০ পাঙ্খো ও বনজোগী

১১.১ ব্রহ্মদেশে অবস্থিত চীন-পর্বত এলাকার দক্ষিণে 'এমন' ও উত্তরে 'মো' উপত্যকাভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে ছিল পাঙ্খো ও বনজোগীদের আদি নিবাস। খুশিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা বান্দরবন পার্বত্য জেলায় এসে বসবাস শুরু করে। পাঙ্খো ও বনজোগী একই জাতির দুটি শাখা এবং দু'ভাই থেকে এদের বংশোদ্ভব ঘটেছে। এ দুই শাখার মধ্যে ভাষাগত ও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিতে বেশ মিল রয়েছে।

১১.২ পাঙ্খো ও বনজোগীরা বিশ্বাস করে যে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পত্যেন নামক একজন দেবতা। এ দেবতা লুসাইদের পুথিয়ান-এর সমকক্ষ। তিনি বিশ্ব-ভূমন্ডলের পশ্চিমাংশে বসবাস করেন এবং দিন শেষে সূর্য তাঁর ঘরে আশ্রয় নেয়। তাদের খোজিং নামে আরও একজন বনদেবতা আছে এবং জুম চাষে সাহায্য করে থাকেন। এ পাঙ্খো ও বনজোগীরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ পূজা-পার্বণ এ খোজিং দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। এদের সমাজে কোবাং নামে এক ধরণের ধর্মপরায়ণ লোকের দেখা পাওয়া যায়। তারা ধর্মচর্চা ও পবিত্র জীবনযাপন করে।

১১.৩ পাঙ্খো ও বনজোগীদের একই গোত্রে বিবাহ বিষিদ্ধ। বাইরে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। যৌবন প্রাপ্ত হলেই ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে পিতামাতা বা অভিভাবকদের মতই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মন দেয়া নেয়ার কারণেও বিয়ে হয়ে থাকে। বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে মৃত স্বামীর ভাইদের দাবী আগে বিবেচনা করতে হয়।

১১.৪ সংসারের সকল কাজে যেমন চাষাবাদ কাঠ কাটা ও আহরণে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাজ করে। এদের মেয়েদেরকে হাটে বাজারে বেচাকেনার কাজে দেখা যায়। মুরংদের মত পাঙ্খো ও বনজোগী সমাজের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী এবং পুরুষদের সকল কাজে সহায়তা করে থাকে।

১২.০ খুমি

১২.১ মধু, থানছি, রুমা ও লামা ইত্যাদি থানার অন্তর্গত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে খুমিরা বসবাস করে থাকে। এদের আদি নিবাস ছিল আরাকান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতির সঙ্গে তারা বর্তমান আবাসস্থলে চলে আসে।

১২.২ 'আওয়া খুমি' ও 'আফি-আ খুমি' নামে দুই শ্রেণীতে এই খুমিরা বিভক্ত। 'আওয়া' নদীমুখ ও 'আফি-আ' নদীর উৎস ব্যবহৃত হয়। আওয়া খুমি ও আফি-আ খুমিরা বিশ্বাস করে থাকে যে তাদের আদি পিতামাতা যথাক্রমে নদীমুখ ও নদীর উৎস থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদেরকে শংখ ও মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তী

বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যেই অধিক হারে দেখা যায় এবং এ নদীদ্বয়কে কেন্দ্র করেই তাদের অধিকাংশ পূজা–পার্বণ হয়ে থাকে।

১২.৩ খুমিদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থাকলেও তারা মূলত জড়বাদী বা ভূতপূজক। লুসাইদের মত এরাও পাথিয়ান দেবতাকে এ বিশ্ব–ভুমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা মনে করে। এছাড়া মগদ নামে একজন দেবতা গ্রাম দেবতা (House-hold Deity) এবং বোগলে নামক আর একজন দেবতা জলদেবতা (Water Deity) হিসেবে খুমি সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

১২.৪ খুমিদের সমাজে পুরুষদের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়। এ কারণে তাদের সমাজ পিতৃপ্রধান। এদের সমাজে নিজ গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যৌবনপ্রাপ্তির পর ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের আগে খুমি যুবক যুবতীদের মধ্যে সহবাস প্রথা প্রচলিত আছে। তবে মিলনের ফলে কোন যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে বিয়ে করতে তার প্রেমিক চুক্তিবদ্ধ থাকে। এটাকে এক ধরনের বিয়েই বলা চলে। গারো সমাজে নিজ গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। স্ত্রী নির্বাচনের জন্য বাইরের গোত্রে যেতে হয়।

এতক্ষণ বাংলাদেশের দক্ষিণ–পূর্ব তিনটি পার্বত্য জেলায় যে সকল ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এবার বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র জাতির লোকজন বসবাস করে তাদের সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হবে। তারপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের খানাভিত্তিক লোকসংখ্যার বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখা যায়।

১৩.০ গারো

১৩.১ গারো সমাজ একটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। গারোদের আদি আবাসভূমি ভারতের পূর্ব দিকের আসাম প্রদেশ। গারো পাহাড়ের নাম অনুসারে তাদেরকে গারো বলা হয়। এ সম্প্রদায়ে প্রধানত দুটি শ্রেণী রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় তাদেরকে আচ্ছিক (Hill Garo) ও লামদানী (Plain Garo) বলা হয়। আচ্ছিক শ্রেণীর গারোরা গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরে গভীর বনে বাস করে এবং লামদানী শ্রেণীর গারোদের ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা ও শ্রীবর্দী এলাকায় অধিকহারে দেখা যায়। এ ছাড়া টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানাতেও অনেক গারো বাস করে।

১৩.২ মাতৃপ্রধান সমাজের নিয়মানুযায়ী গারো মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পেয়ে থাকে। ছেলেরা বিয়ের পর বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে। নারীপুরুষ উভয়ে সংসারে কাজ করলেও তুলনামূলকভাবে পুরুষদের প্রভাব কম।

১৩.৩ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মত গারোদের মধ্যে গোত্র বিভাগ রয়েছে। আচ্ছিক গারোরা (১) অয়, (২) আবেং ও (৩) সাংগমা নামে তিনটি গোত্রে বিভক্ত।

১৩.৪ গারোদের ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক জড়োপাসক ও ভূতপুজারী রয়েছে। তবে গারোদের পুরোপুরি হিন্দু বলা যায় না।

১৩.৫ "গারোদের দেবদেবীর মধ্যে তাতারা রাবুগা-ই প্রধান। তাঁর আদেশেই নস্ত নপান্তু এবং মাচি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাছাড়া গারো সমাজে সালজং (সূর্যদেব), ছোছুম (চন্দ্র), নোরিংগ্রো নোজিংজু (তারকারাজি), গোয়েরা (বজ্র) নোরোচিত কিসরী বাক্রী (বৃষ্টি) সেন (মাটি বা পৃথিবী) আছিমা দিংগছিমা (ছোছুম বা চন্দ্রের মা) কালকেম (দোয়ের বা বজ্রের ভাই) চোরাবুদি (শস্যদেবতা), বোকিম(বীজের সার রক্ষক) সিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ (ধানের তত্ত্বাবধায়ক) ও নবাং (মৃতের রক্ষক) প্রভৃতির প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে গারোরা এসব দেবদেবীর পূজা করে থাকে। তাছাড়া পাহাড়া-পর্বত নদনদীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে দেখা যায়। এসব পূজাপার্বণের সঙ্গে কখনো কোনো সংস্কার সম্পৃক্ত থাকে।(আবদুস সাত্তার, পৃঃ ২৬১-২৬২)

১৩.৬ হিন্দুদের মত গারোরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। হিন্দুদের মত গারোরাও বিশ্বাস করে যে এজগতে অসৎ কাজ করলে পরজন্মে মানবেতর জীব হিসেবে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

১৩.৭ পূর্বে গারোরা পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতিসমূহের লোকদের মতই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তারা সমতল ভূমির বাঙালীদের মতই চাষাবাদ করে। নারীপুরুষ উভয়ই এ চাষে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া কৃষিকাজের বাইরে তারা কাঠ কেটে সে কাঠ নিকটস্থ বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে। কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানিয়েও তারা বিক্রি করে। হাটে বাজারে বেচাকেনা গারো নারী পুরুষ উভয়ই করে থাকে।

১৪.০ হাজং

১৪.১ হাজংরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বিয়ের ব্যাপারে বা অন্যান্য সাংসারিক কাজে গারোদের মত মেয়েদের প্রভাব হাজং সমাজে নেই। অনেকেই মনে করে থাকে গারো ও হাজং একই গোষ্ঠীভূক্ত দুটি শাখা মাত্র। হাজংরা ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমির সুষং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট শ্রীবর্দী ও বিরিশিরী এলাকায় বাস করে থাকে। হাজংরা গারোদের মতই আসাম দেশ থেকে তাদের বর্তমান আবাসস্থলে চলে আসে। কিন্তু হাজংরা নিজেদেরকে সনাতনপন্থী হিন্দু বলে স্বীকার করে। এমনকি নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত বলেও দাবি করে থাকে।

১৪.২ হাজংরা মাত্র দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত (১) বায়্যাবছড়ি ও (২) পরমার্থী। এ পরমার্থীরা হিন্দুদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত। কেননা তারা গরু ও শুকরের মাংস খেতে পারে না এবং মদ পর্যন্ত তারা স্পর্শ করতে পারে না। মদ তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে বায়্যাবছড়ি গোষ্ঠীর লোকেরা হিন্দুদের শাক্তদের মত জীবনযাপন করে।

১৪.৩ হাজংরা হিন্দুদের প্রায় সব দেব-দেবীকেই মান্য করে থাকে। তবে শিব ও দুর্গার প্রতি তারা সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করে। পূর্বে বিয়ে বা পূজা -পার্বণে হাজংরা কোন ঠাকুর বা পুরোহিতের শরণাপন্ন হত না। বর্তমানে পুরোহিতের প্রচলন করা হয়েছে।

১৪.৪ হাজং রমণীরা সাধারণত স্বামীর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত হয়। অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ এক কালে হাজং সমাজে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া দুই গোত্রের চিতর বা একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে চালু আছে। বিয়ের পূর্বে কোন মেয়ে গর্ভবর্তী হলে দায়ী পুরুষকেই তাকে বিয়ে করতে হয়। সাধারণত পিতামাতা বা অভিভাবকদের মতের ওপর নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরমার্থী গোত্রে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মতামত প্রাধান্য পায়। হাজং সমাজে বাল্য বিয়ে নেই বললেই চলে এবং স্ত্রী বন্ধ্যা না হলে সাধারণত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা হয় না।

১৪.৫ বিবাহ বিচ্ছেদ এ সমাজে প্রচলিত আছে, তবে গর্ভবর্তী স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিধবা বিয়ের নিয়মও এ সমাজে আছে কিন্তু মৃত স্বামীর কোনো ভাইয়ের সঙ্গে এ বিয়ে হতে পারে না। এটা একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। পরমার্থীগোত্রে বিধবা বিয়ের প্রচলন নেই।

১৪.৬ পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অংশ নেই। তবে বিয়ের সময় মেয়েদের প্রচুর যৌতুক দিতে হয়। এ প্রথা চাকমা, টিপরা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে প্রচলিত। ছেলেরা সমান হারে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পায়।

১৪.৭ পূর্বে হাজংরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তারা সমতলভূমির মতই চাষাবাদ করে থাকে। নারীপুরুষ উভয়েই এই কাজে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া কাঠ কাটা এবং কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করে তারা বাজারে বিক্রি করে। নারীরা দল বেঁধে গভীর অরণ্যে কাঠ কাটতে যায়।

১৫.০ মনিপুরী

১৫.১ মনিপুরীরা বর্তমান ভারতের মনিপুর প্রদেশ থেকে ১৭৬৫ সালের পর সিলেটে চলে আসে। অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির মত তারাও সিলেটের ভূমিজ সন্তান নয়। ঢাকার মনিপুরপাড়া এক সময় মরিপুরীদের আবাসস্থল ছিল। এছাড়া সিলেট শহরের কাছে মনিপুরপাড়া, মৌলভীবাজার জেলার ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জ জেলার আসামপাড়া অঞ্চলে মনিপুরীরা বসবাস করে থাকে।

১৫.২ মনিপুরীদের মধ্যে একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। মেয়ের জন্য অন্য গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হয়। মনিপুরীদের সমাজে নিম্নশ্রেণীর এক ধরনের লোকজন আছে যারা ধনীদের বাড়িতে কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং হিন্দুদের শূদ্র শ্রেণীর মত এদর সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে। বিধবা বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদ মনিপুরী সমাজে প্রচলিত। তালাকপ্রাপ্ত রমণী পানি খাওয়ার পাত্র এবং কটিদেশ আবৃত করার পরিধেয় কাপড় ছাড়া সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে।

১৫.৩ বিভিন্ন গল্প উপন্যাস ও প্রেমকাহিনীতে মনিপুরী সাহিত্য ভরপুর। তাছাড়া মনিপুরী নৃত্য এ উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি অনন্যসাধারণ স্থান দখল করে আছে।

১৬.০ খাসীয়া

১৬.১ খাসীয়ারা ভারতের আসাম প্রদেশের খাসীয়া, জৈন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার জৈন্তিয়াপুর, জাফলং, তামাবিল এবং সুনামগঞ্জ জেলার খাসীয়া, জৈন্তিয়া পাহাড়ের সীমান্তবর্তী অংশে অনেক খাসীয়া বসবাস করে থাকে। অনেকেই মনে করে প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বে খাসীয়ারা এসব এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে।

১৬.২ উব্লাউ নাংমউ খাসীয়ারদের প্রধান দেবতা। তাছাড়া আরও অনেকগুলো দেবতার প্রাধান্য খাসীয়া সমাজে বিদ্যমান।

১৬.৩ এদের মধ্যে রয়েছে উব্লাউ মুলুক (সাম্রাজ্যের পরিচালক), উব্লাউ মতুং (জলদেবতা), উব্লাউ সংসপাহ (ধনসম্পদের দেবতা) উরিং কেউ (গ্রামদেবতা), কায়িহ (রোগজ্বরার দেবতা) ও কাখলাম (কলেরা মহামারীর দেবতা)" । প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৯) খাসীয়ারা পরজন্মে বিশ্বাস করে না। বিবেকের শাসনকেই তারা সবচেয়ে বড় শাসন বলে মনে করে।

১৬.৪ খাসীয়াদের মধ্যে একাধিক গোত্র রয়েছে। বিয়ের জন্য অন্য গোত্র থেকে মেয়ে আনতে হয়। কারণ একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। খাসীয়া সমাজ মাতৃপ্রধান এবং সে কারণে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রাধান্য দেখা যায়। মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্বামীকে তালাক দিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামী দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারে। বিয়ে সাধারণত ছেলেমেয়েদের পছন্দ অনুসারেই হয়ে থাকে।

এসব ছাড়াও বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁ ও রাজবংশী নামে ক্ষুদ্র জাতিসমূহ বসবাস করে থাকে। এদের জীবনযাত্রার মধ্যে আছে বৈচিত্র ও সরলতা। এরা সবাই মানবিক গুণাবলীর অধিকারী। এদের লোকগাঁথা, কথা, উপকথা ও নানাবিধ কাহিনী বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৭.০ উপসংহার

১৭.১ পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসমূহের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন রয়েছে। তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোককাহিনী, কথা,উপকথা বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে নানা ভাবে উন্নত করেছে। এ সকল পাহাড়ী লোকদের জীবনধারাকে বাংলাদেশের সমতলভূমির জীবনযাত্রার পরিপূরক করে তোলার জন্য আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। তাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

১৭.২ বর্তমানে কিছু বিপথগামী চাকমাদের জন্য পার্বত্য জেলাসমূহে বিশেষ করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মাঝে মাঝে কিছুটা অশান্তি দেখা যায়। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য গত দেড়যুগ ধরে বাংলাদেশ সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে। যে সব চাকমারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে চলে গিয়েছিল তারা বর্তমানে বাংলাদেশে তাদের

নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসছে এবং তাদের পূণর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ, ১৯৯৩ *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, রাঙামাটি, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

২। সাত্তার, আবদুস্, ১৯৭৫ *অরণ্য জনপদে*, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, পৃঃ ২০, ৩৯, ৬৩, ১৩৩, ১৬১, ২২১, ৩২৯,

৩। সাত্তার, আবদুস, ১৯৭৯ *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা,

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৪। সাত্তার, আবদুস, ১৯৮০ *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৫। সাত্তার, আবদুস, ১৯৭৭ *অরণ্য সংস্কৃতি*, ঢাকা, মুক্তধারা।

৬। Bangladesh Bureau of Statistics, 1995 *Statistical Pocket Book, 1994*, Dhaka, 1995, pp 108-109.

৭। Bessaignet, Pierre, 1958 *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, p.4

৮। Bessaignet, Pierre (Ed)1964 *Social Research in East Pakistan*, Dhaka, Asistic Society of Pakistan, 1964.

৯। Chowdhury, Anwarullah et al (Ed)*1987 Socialogy of Bangladesh Problems ands Prospects* Dhaka, Bangladesh Sociology Association,

১০। Richter, Maujrice N, 1987 *Exploring Sociology*, Illinois, F, E, peacock Publishers, INC, .

১১। Shelley, Mizanur Rahman (Ed) 1992, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story*, Dhaka, Centre For Development Research, Bangladesh.

Tribal household and population by tribe, 1991

Locality & Tribe	Bangladesh		Barisal Division		Khulna Division		Chittagong Division		Dhaka Division		Rajshahi Division	
	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn
Total	233417	1205978	7591	40506	7723	40558	129856	687319	24994	123258	63253	314337
Bangshi	419	2112	-	-	-	-	-	-	419	2112	-	-
Bawm	1349	6978	-	-	-	-	1349	6978	-	-	-	-
Buna	2822	13914	-	-	-	-	-	-	-	-	2822	13914
Chak	372	2000	-	-	-	-	372	2000	-	-	-	-
Chakma	46637	252986	205	1049	119	614	45748	248321	564	2999	1	3
Coach	2541	12631	-	-	-	-	-	-	2541	12631	-	-
Garo	14042	68210	-	-	-	-	1310	6859	12505	60221	227	1130
Hajong	2337	11477	8	52	-	-	439	2325	1890	9100	-	-
Harijon	12	63	-	-	12	63	-	-	-	-	-	-
Khasia	2506	13412	-	-	-	-	2292	12280	-	-	214	1132
Khyang	418	2345	-	-	-	-	418	2345	-	-	-	-
Khomoi	238	1241	-	-	-	-	238	1241	-	-	-	-
Lushai	124	662	-	-	-	-	124	662	-	-	-	-
Mahat/Mahatto	668	3534	-	-	-	-	-	-	-	-	668	3534
Marma	30004	154216	296	1523	22	107	29274	150419	410	2159	2	8
Monipuri	4712	24902	-	-	-	-	4712	24902	-	-	-	-
Munda/Mundia	394	2112	-	-	392	2101	-	-	-	-	2	11
Murang	4273	22178	-	-	-	-	4273	22178	-	-	-	-
Muro/MO	620	3211	-	-	-	-	18	126	-	-	602	3085
Pahari	357	1853	-	-	-	-	-	-	-	-	357	1853
Pankue/Pankoo	588	3227	-	-	-	-	588	3227	-	-	-	-
Rajbangshi	1085	5444	-	-	476	2474	-	-	-	-	609	2970
Rakhain	3017	16932	708	3415	-	-	2309	13517	-	-	-	-
Saontal	40950	202744	-	-	575	3172	1977	10380	157	833	38241	188359
Tanchanghya	4043	21057	-	-	-	-	4043	21057	-	-	-	-
Tipra	228	1242	-	-	-	-	138	762	90	480	-	-
Tripura	15860	79772	-	-	-	-	15476	77677	380	2061	4	34
Urang	2285	11296	-	-	38	195	776	3930	-	-	1471	7171
Uruo/Urua/Uria	506	2481	-	-	-	-	-	-	-	-	506	2481
Others	50010	261746	6374	34467	6089	31832	13982	76133	6038	30662	17527	88652

Source : Population Census, 1991, BBS.Statistical Pocket Book, 1994 PP.108-109

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

মুহাম্মদ হাসান ইমাম *

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ও প্রকল্পে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও স্থানীয় সম্পদ সংগঠিতকরণের মতো বিষয়সমূহের সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট করার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না। অংশগ্রহণমূলক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, পারিবেশিক যত্ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের মতো বহুকথিত উদ্দেশ্যসমূহের সমন্বয়কে যথেষ্ট মূল্য এখনো দিতে পারা যায়নি। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকৃতি, প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং গণ-অংশগ্রহণের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার অবকাশ থেকে যায়। এ ধরনের ধারণা ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে পরিবেশ, কৃষি, অবকাঠামো ও অংশগ্রহণের স্থানীয় সমন্বয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য ব্যবস্থাপনাকে উদ্ভাসিত করতে পারে। এ আলোচনার প্রধান পূর্বানুমান (assumption) হিসেবে এমন ধারণা পোষণ করা হয়েছে যে, স্থানীয়ভিত্তিক কার্যক্রম আঞ্চলিক ও জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে সম্পূরক অবদান রাখতে সক্ষম।

২.০ পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ

২.১ স্থানীয় প্রতিবেশতাত্ত্বিক উৎকণ্ঠা (Local Ecological Concerns): একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic) পরিবর্তন একভাবেই পরিবেশের জন্য যথেষ্ট হুমকির সৃষ্টি করেছে; কারণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, ঘনত্ব, বসতি ও অভিগমন পরিবেশগত অবনয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। তবে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে কৃষির ভূমিকা প্রবল, কারণ তা জনসংখ্যার ৮০% কে নিয়োজিত রেখেছে এবং জিডিপি-র ৪০% সংযোজিত করে, যা প্রকারান্তরে ৮০% ভূমিব্যবহারকে চিহ্নিত করে। ১৯৮৪ সালে ৭০.৩৪% খামার ছিল ছোট ও প্রান্তিক। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫% থেকে ৬০ শতাংশে। সম্পদের সংস্থান ও সম্পত্তি-

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধিকারের নিরিখে অনেকেই এ প্রবণতাকে মেরুকরণ (polarization) এবং গরিবায়ন (pauperization) প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Rahman, 1986; Jahangir, 1979; van Schendel, 1981; Westergaard, 1978)। সুতরাং একথা সত্য যে, অপূরণীয় অবনয়ন, অবলুপ্তি ও দুর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় ধরনের কারণই দায়ী। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও সীমিত সম্পদের প্রেক্ষাপটে সবার জন্য বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা ও নিয়োজনের মতো বিষয়সমূহ যথেষ্ট কঠিন। এরকম ধারণা অমূলক নয় যে, Even the most carefully considered resource management plans cannot cope with ever-increasing population (WRI, 1990: 15)। অনস্বীকার্য যে, শুধু সংখ্যাই নয়, জনসংখ্যার গুণগত নিম্নমাত্রা পরিবেশগত অবনয়ন ও বিকৃত উন্নয়নের জন্য দায়ী। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাথে তাই মানবীয় আচরণের দিকটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে দেখা গেছে (Hossain, 1990, 16)। এসব প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখে বলা যায় বাংলাদেশে দারিদ্র, জনসংখ্যা ও পরিবেশ একই সূত্রে বাঁধা।

২.২ চাষযোগ্য সীমায় পৌঁছে যাওয়ায় একদিকে কৃষিতে নিয়োজন সম্ভাবনা যেমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে পুঁজিঘন শিল্পায়ন সামান্যই কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। অথচ গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের অবিচল ধারাটি অক্ষুণ্ন আছে। জানা যায় যে, ১৯৮৯ সালে শহরমুখী অভিগমনের অর্ধেক ঘটেছে ভূমিহীনতা ও নদীভাঙ্গনের ফলে। সরকারি প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হয়েছে যে, উচ্চ জনঘনত্ব, বন, মৎস্য, ও ভূমির অতি-ব্যবহার ঘটিয়েছে ফলশ্রুতিস্বরূপ ভূমিক্ষয়, উর্বরতা হ্রাস, আহরণযোগ্য মৎস্যের (capture fisheries) অভাব ও ব্যাপক বননিধন দ্রুততা পেয়েছে (GOB, 1991: 21)। মৌল উৎপাদন উপায় হলেও এদেশে ভূমিব্যবহার সরকারি ও বেসরকারিভাবে সমান মাত্রায় অপরিকল্পিত। কৃষিজমির অকৃষি রূপান্তর পরিবেশ-অনুকূল নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নতুন বসতিস্থাপন, বাণিজ্যিক প্রসার সাধারণভাবে ভূমির উপরিস্তরের ক্ষয়কে অবারিত করেছে। বায়ু প্রবাহ, প্লাবন জল, অপসৃয়মান উদ্ভিজ্জ ও চাষাবাদ পদ্ধতিও প্লাবন সমভূমির রূপান্তর ঘটানোর জন্য দায়ী মনে করা হয়েছে।

২.৩ নদী তীরের ভাঙন একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে ছোট-বড় নদী, বিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতি গঠন-বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনের ধরন এবং ফলশ্রুতি ভূমি ক্ষয়, ভাঙন, পলিপত্তন, ও চরগঠনকে ব্যাপকতা দিয়েছে (Chowdhury and Bhuiya, 1990: 23)। এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক নদী রয়েছে যেগুলোর সুফল বৃদ্ধি না পেলেও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহরকে সতত হুমকির সম্মুখীন করে রেখেছে। দেশের উপকূল ও অভ্যন্তরে জলোচ্ছ্বাস ও ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে (Islam, S, 1890: 18)। লবণ-আক্রান্ত এলাকার বিস্তৃতি ঘটেছে ৩.০ মিলিয়ন হেক্টরে। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পুনর্সঞ্চয়নের কারণে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন (Islam, M. N. 1990: 21; Dean and Treygo, 1989:39 DANIDA, 1989: 30; GOB, 1991:29)।

২.৪ জলজ সম্পদের ধ্বংস ও ভূমির বনায়নের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারকে একটি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একফসলী চাষাবাদের প্রসার, উচ্চতর চাষ ঘনত্ব, ভ্রান্তচাষ অনুক্রম, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, জৈববস্তুর হ্রাসমানতা, জলাবদ্ধতা, প্রভৃতিকেও ভূমি অবনয়নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা হয়েছে (Dean and Treygo, 1989:24; DANIDA, 1989:28)। কৃষি-রাসায়নিকের (agrochemicals) ব্যবহার, মৃত্তিকার গুণ, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ জল এবং জীন বৈচিত্রসহ 'জেনেটিক' সম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে (Islam, S. 1990:4GOB, 1991:33)। তাছাড়া, চিংড়িচাষসহ ধান চাষের একক সম্প্রসারণ একদিকে যেমন স্থানীয় প্রতিবেশতাত্ত্বিক ভারসাম্য নষ্ট করছে, তেমন ঐতিহ্যগতভাবে জীবিকা নির্বাহকারী সম্প্রদায়সমূহের জন্য চরম প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে। যাহোক, একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৮১ সালে অবনয়িত ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৭.৪%, আর ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বননিধনের ফলে বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে এসেছে শতকরা ২০ থেকে ৭ শতাংশে; ১৯৭৬-১৯৮০ সময়কালে বনবিলোপের বার্ষিক হার ছিল ৮,০০০ হেক্টর (Pookpakdi, 1993:3)।

২.৫ বাংলাদেশের নদীবহুল ভূমির উপরিভাগে হৃদ, পুকুর, হাওড়, বাওড়, দিঘী ও বিলের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে শুধু নদী ও খালের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ২৪ হাজার কিলোমিটার। নদীর বার্ষিক গড় জল প্রবাহের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ৩৭,৫৯০ কিউবিক মিটার (Rashid, 1991: 25)। একটি সাধারণ সম্পদ (common resource) হিসেবে এসব জলাশয় মানুষের জীবন, জীবিকা ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করতো। সম্প্রদায়গত পর্যায়ে কৃষিকাজ, গার্হস্থ্য জীবন ও যোগাযোগের জন্য এসব জলাধার ও জলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ এই নদীবাহিত জলের কারণে অথবা নদী সংলগ্নতার কারণে মোট এলাকার ১৮% ভূমি প্লাবিত হয় প্রতি বৎসর। অতিরিক্ত বন্যার বছর উপদ্রুত এলাকার পরিমাণ ২৬% হতে পারে যা মোট চাষযোগ্য জমির ৬০% (Dean and Treygo, 1989:32) । বন্যা অনেক ধরনের ক্ষতির সম্মখীন করে; যেমন, ফসলহানি, সুপেয় জলের অভাব, ভূমিক্ষয়, স্বাস্থ্য সমস্যা, বাসস্থানের বিলুপ্তি, অবকাঠামোর বিনাশ, মৌসুমী কর্মহীনতা ও মৃত্যু। আবার এটিও সত্য যে, জলের উন্নয়নমূলক ব্যবহারও ভিন্নপ্রকৃতির সমস্যা সৃষ্টি করছে (Conway, 1990:133)। বড় ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগ্রহণকে অর্থহীন মনে করা হচ্ছে, কারণ তাতে বাঁধজাতীয় বাধার কারণে প্লাবন সমভূমিতে মাছের চলাচল বিঘ্নিত হয়ে থাকে (Ali, 1991:15)। এ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে প্রায় ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি হারাতে হয়েছে যেখানে মাছ উৎপাদিত হতো। আগামী ২০ বছরে এরকম উদ্যোগের কারণে ৭৩,০০০ থেকে ১,১০,০০০ টন অভ্যন্তরীণ আহরণযোগ্য মাছ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে আশংকা করা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক প্লাবনের প্রতিবেশতাত্ত্বিক গুরুত্বও সুবিদিত।

৩.০ পরিপ্রেক্ষিত নীতিগ্রহণের ইংগিত (Perspective Policy Implications):

পরিবেশের বৈরিতা নিরাপত্তাহীনতার কারণ হলেও অর্থনৈতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, প্রতিবেশতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতার পারস্পরিক অসংলগ্নতা কম দায়ী নয় (Abdullah and Engelhard, 1993:8)। সুতরাং পরিবেশগত বিপর্যয়কে সামাজিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডের নিরিখে প্রত্যক্ষ করার প্রবণতা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে পরিবেশগত পরিস্থিতি ও আর্থসামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কতগুলো সাধারণ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; যা পরিবেশ, উন্নয়ন ও অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধনের বিষয়টি ধারণায়িত করতে সাহায্য করে। যেমন ঃ

(১) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে ভূমিহীনতা, মেরুকরণ ও গরীবায়ন অবস্থার বিস্তৃতি

(২) নিঃস্বকরণের কারণ ও ফলশ্রুতি হিসেবে পারিবেশিক বিপর্যয়

(৩) জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তা যা মৌলিক চাহিদা, যেমন, কর্মনিয়োজন, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রভৃতির পরিপূরণ না হওয়ায় দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করছে

(৪) ভূমির অবনয়ন, বনের বিনাশ এবং জলদূষণ

(৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, খরা, ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় ভিত্তিক সম্পূরক উদ্যোগের অভাব

(৬) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভুত নতুন ব্যবস্থাদি যা জীববৈচিত্র্য, বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ ও পুনঃপূরণীয়তার (replenishability) সুযোগ হ্রাস করছে

(৭) স্থানীয় সম্পদ সংগঠিতকরণ, উন্নয়ন প্রশাসন ও টেকসই কৃষিকর্মের মতো বিষয়ে গণ-অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে পারে এমন লাগসই প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা

(৮) জনসাধারণের জ্ঞান, ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক ক্ষমতা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন সম্ভাবনা সম্পর্কে উন্নাসিকতা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন ভাবনায় রাজনৈতিকীকরণের প্রশ্রয় প্রদান

(৯) ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের বিমোচন, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে কৃষিকাঠামো ও সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রয়োজনীয় সংস্কারের অনুপস্থিতি যা অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে লক্ষ্যাভিসারী ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

৪.০ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও কার্যক্রম গ্রহণের অপরিহার্যতা

৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও কার্যক্রম বিষয়ক এজেন্ডাঃ বাংলাদেশের পরিবেশ এখনো স্বল্পমাত্রার বাণিজ্যিকীকরণ, নিম্নমাত্রার প্রযুক্তি ব্যবহার ও স্বল্প গতির নগরায়ন দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত। শিল্প-অগ্রসর সমাজের পরিবেশগত সমস্যার তুলনায় এখানকার পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃতি তাই কিছুটা ভিন্নধর্মী। সীমিত সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি নির্বাচন, শিল্পজাত বিকল্প আবিষ্কার, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন-অভিমুখীনতার মত বিষয়সমূহ তাই স্বকীয় দেশভাবনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরিবেশ-দারিদ্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অসম্পূর্ণতা, অবিচার, অনিশ্চয়তা ও সমতার প্রসঙ্গসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যে, It is now increasingly realized that the natural environment is a finite resource and does not have the capacity to absorb and cushion all the adverse impacts on it by modern technologies and rapidly increasing population (Chowdhury, 1993:35)।

৪.২ আমাদের দেশের উন্নয়ন চিন্তায় এমন ধারণার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, বিলম্বিত উপলব্ধি, অসমর্থ প্রতিষ্ঠান, ও অসঠিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সার্বিক পরিস্থিতিকে অবনতিশীল করেছে। সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সম্প্রদায়গত কার্যক্রম গ্রহণ ও তার জন্য আবশ্যক সামাজিক -সাংগঠনিক পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। আজকের দিনে এটি অন্তত পরিষ্কার হয়েছে যে, পরিবেশ বিপর্যয়রোধ একটি পর্যায়ে সম্পন্ন করার মতো বিষয় যেমন নয়, তেমনি এটি কোন বিশেষ খাতের (sectoral) সমস্যাও নয়; বরং সমাজ, সংস্কৃতি, সম্পদ, পরিবেশ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আন্তঃক্রিয়ার ফলশ্রুতি। বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর বৃহৎ প্রকৃতির উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও একথা বলা যায় যে, সামাজিক-পরিবেশতাত্ত্বিক ব্যবস্থার (socio-ecological perspective) দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম- পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সংগঠিত করণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার আবশ্যকতা রাখে। এমন ভাবনার পেছনে একটি পূর্বানুমানই যথেষ্ট যে, সামাজিক ও প্রতিবেশতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ, জীবন ও জীবিকা ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে ভূগোল, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বা পরিবেশনীতিকে আলাদা আলাদা বিবেচনার বিষয় ভাবার যৌক্তিকতা নিতান্তই কম। প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয়টি এক্ষেত্রে কেন এত গুরুত্ব বহন করে সে বিষয়ে যাবার আগে আমরা এমন কিছু আবশ্যক কার্যক্রম (needed actions) চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলো প্রতিষ্ঠান-নির্ভর সাংগঠনিক আয়োজন, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও স্বচালিত প্রেষণার যৌক্তিকতাকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে।

১. আরো বাস্তবমুখী ও সমতাভিত্তিক কৃষিকাঠামোগত সংস্কার সাধন, যাতে করে সম্পদহীন জনগোষ্ঠী উদ্যোগী হবার মতো ক্ষমতাবান হতে পারে

২. কৃষিকাঠামোগত সংস্কারে কৃষি-সমাজ-প্রতিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা

৩. সাধারণ সম্পত্তি ও সম্পদসহ সরকারী সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো সমতাবিধানমূলক ও সমষ্টিভিত্তিক নীতি গ্রহণ

৪. সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দরিদ্রমুখী ও সমষ্টি-চেতনাভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও তার আইনসিদ্ধকরণ

৫. কৃষি, জনসংখ্যা, বসতি ও আচরণগত বিষয়ের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি

৬. উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে সাংগঠনিকভাবে নিশ্চিতকরণ

৭. পরিবেশগত সচেতনতাকে বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

৮. বিশেষ লক্ষ্যদল (target group) সংগঠিত করণ ও তাদের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

৯. কল্যাণমুখী শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন যা স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সমান ব্যবহার উপযোগিতা পায়

১০. স্বল্পমূল্যের বাসস্থান, পরিকল্পিত বসতি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও জীবন রক্ষাকারী মৌলিক সুবিধাদির সংস্থান

১১. যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচন, টেকসই কৃষি ও অধিকতর সমতাভিত্তিক সুবিধা বিধানের লক্ষ্যকে নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন পদ্ধতি (Farming System Research and Development Approach) উদ্ভাবন

১২. সমষ্টিগত উদ্যোগ ও প্রস্তুতিগ্রহণের মাধ্যমে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গণ, মরুকরণের মতো সমস্যা থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা

১৩. ভূ-উপরিস্থ জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়ন

১৪. জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণ

১৫. অবিভাজ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

১৬. বর্তমান অবকাঠামোগত সুবিধার সমন্বিত যত্নগ্রহণ ও এর উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরতার চেতনা সংগঠিতকরণ

১৭. বনাঞ্চলসহ সরকারী ব্যবস্থাধীন সম্পদের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক শর্ত ও আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ

১৮. বসতভিটা, ক্ষেত ও অন্যান্য পরিসরে কৃষিবনায়নের লক্ষ্যে উন্নত অথচ প্রয়োজনসিদ্ধ প্রযুক্তি ও নক্সা প্রণয়নে জনগণ, সম্প্রসারণকর্মী ও গবেষকের মধ্যে আরো বাস্তবোচিত সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি

১৯. স্থানীয়ভাবে জ্বালানী, কাঠ, নির্মাণ সামগ্রী ও জৈব শক্তির উৎস ও সরবরাহকে নিশ্চিতকরণ

২০. খামার ব্যবস্থা, গবেষণা ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে বসতভিটা উৎপাদন ব্যবস্থার (homestead production system) অনুপুঙ্খ সমস্যা নির্ণয় ও উন্নত নক্সা প্রণয়ন

২১. হাঁস–মুরগি পালন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সবজিবাগান চর্চা, বীজ সংরক্ষণ, ফলবাগান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়কে তীব্রকরণ ও বহু–মুখীকরণ

২২. সুতাকাটা, বয়নশিল্প, মৃত্তিকাশিল্প, বনজশিল্পসহ অন্যান্য কারিগরী (artisan) ও হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য উপকরণ, বাজার, মূল্য, ঋণ, চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা দান

২৩. সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারণার ব্যাপ্তকরণ ও বাস্তবায়ন

২৪. বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সেক্টর ও এলাকাভিত্তিক সমবায় মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ গ্রহণকে সংহত করা যাতে করে আয়, সম্পদ, অধিগম্যতা ও ক্ষমতায়নের মতো জরুরী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে

৪.৩ উপর্যুক্ত ক্ষেত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করলে একথা বলার দরকার হয় না যে, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রশাসনের স্থানীয় উদ্যোগ কোনক্রমেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো নির্মাণ বা কৃষি আধুনিকীকরণের মতো বৃহৎ প্রকৃতির প্রকল্পের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হতে পারে না। স্থানীয় পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও যত্নগ্রহণে ব্যর্থতা জাতীয়ভাবে গৃহীত কার্যক্রম, প্রকল্প ও উদ্দেশ্যসাধনের ব্যয় ও ভ্রান্তি বৃদ্ধি করতে বাধ্য। আমরা জানি যে, সরকারীভাবে 'পরিবেশ–দারিদ্র–জনসংখ্যা' সম্পর্কটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে; এছাড়া বিচিত্র সম্পদের টেকসই উন্নয়নের সরকার জনগণের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধন বলতে যে দাপ্তরিক সমন্বয়ের ধারণা পাওয়া যায় তা থেকে সরকারি পরিবেশ ভাবনা ও টেকসই উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা কার্যোপযোগী (operationalized) রূপটি সুস্পষ্ট হয়না। বরং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকান্ড ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে শূন্যতাই পরিলক্ষিত হয়।

৫.০ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও এ সম্পর্কিত প্রত্যাশার স্বরূপ

৫.১ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ব্যাপারটি সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন দপ্তর, পরিদপ্তর ও এজেন্সি তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় যে আর নেই, এমন ধারণা বর্তমানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। অনুরূপভাবে আন্তঃদপ্তর, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃএজেন্সী সমন্বয়সাধনকে পরিবেশ সংক্রান্ত কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক উচ্চারিত হতে দেখা যায়। সরকার অবশ্য তৃণমূল পর্যায়ে জৈববস্তুসার, মৃত্তিকার উর্বরতা ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণের কথা বলেছে। তবে তার বাস্তবায়ন ও সে সংক্রান্ত পদক্ষেপ স্পষ্ট নয়। এটি সুবিদিত যে, বাংলাদেশে কিছু কর্ম গবেষণা (action research) পরিপক্কতার এক পর্যায়ে কৌশল ও উদ্দেশ্যের বৃহত্তর সমন্বয়ের কথা সুপারিশ করেছে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'total village approach' এবং খামার ব্যবস্থা গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'holistic approach' এ প্রসঙ্গে করা যায়, এ ধরনের উপলব্ধি একদিকে যেমন গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন দিকের পরস্পর সংলগ্নতার বাস্তব অভিজ্ঞতা–তাড়িত; অন্যদিকে খণ্ডিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অক্ষমতা নির্দেশক মনে করলে ভুল করা হবে না। পরিবেশ সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা হলো সর্বশেষ উপলব্ধি তাগিদ, যা এই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতাকে আরো আরো বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছে।

৫.২ 'Poverty-environment linkages' অথবা 'environmentally sound multiple use of resources' এ ধরনের অভিমুখীনতারই বহিঃপ্রকাশ (দেখুনঃ GOB, 1991);, কিন্তু যখনই সম্প্রদায় বা জনগণের অংশগ্রহণের কথা এসেছে তখনই 'NGO-private sector partnership-এর মত জনতুষ্টিমূলক সমাধান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।[১] তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বেসরকারী সংগঠনসমূহের তৃণমূল পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ সরকারকে অনেকখানি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা ও সরকারী সম্পত্তিতে চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন, কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারিভাবে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা অনেকটা দুর্বল প্রত্যক্ষণ ও প্রতিজ্ঞার পরিচায়ক।

৫.৩ বাংলাদেশে সম্পদ ও সম্পর্ক যেসব জটিল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ অগ্রযাত্রার সহায়ক নয়। এক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা, বিধি, মূল্যবোধ ও আচরণ প্রয়োজন যা প্রত্যাশিত রূপান্তরের সহগামী হতে পারে। আবার এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও সমন্বয়ের বিষয়বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমাদের মতে অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তিনটি বিষয়কে সংশিষ্ট করে; (১) প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের শক্তিসামর্থ, দুর্বলতা ও পক্ষপাত অনুধাবন, (২) সুসংজ্ঞায়িত লক্ষ্যের নিরিখে আবশ্যক প্রতিষ্ঠান প্রণয়ন, ও (৩) জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ যাতে সম্প্রদায়ের ভেতর ও বাইরের বিশেষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কৌশলের সমন্বিত প্রয়োগ সম্ভব হয়।

৫.৪ প্রচলিত প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রচেষ্টায় নীতিগত পর্যায়ে যে বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব পায়নি তা হলো; (১) গ্রামাঞ্চলের সাধারণ এবং বিশেষত দরিদ্র গৃহস্থালীর অনিশ্চয়তা ও

নিরাপত্তাহীনতা। ভূমিস্বত্ব, বাজারনীতি, মূল্যনীতি, প্রযুক্তিনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মনে করা যেতে পারে, (২) সম্পত্তি সম্পর্ক, জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক, ক্ষমতা সম্পর্ক, প্রভৃতির প্রকৃতি ও আন্তঃসংযোগ যা দুর্দশাগ্রস্থ গৃহস্থালীসমূহের অভিযোজন ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, (৩) আকার, গঠন, প্রকৃতি, উৎপাদনশীলতা ও খামার পরিবেশের দিক দিয়ে আন্তঃগৃহস্থালীগত ভিন্নতা, (৪) প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা, (৫) আকৃতি উদ্যোগের বর্তমান প্রসার, প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতা; এবং (৬) বর্তমান উন্নয়ন প্রয়াস ও প্রকল্পের সুবিধাভোগকারী জনগোষ্ঠীর সত্যিকার সংখ্যা ও স্বরূপ।

৫.৫ দারিদ্র ও অনুন্নয়নের স্বীকৃত সম্পর্ককে মনে রেখে পরিবেশগত সংরক্ষণ, কৃষি প্রবৃদ্ধি ও সুফল বন্টনের ধরনকে এমনভাবে নির্ণয় করা দরকার, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতভিত্তিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে স্থানভিত্তিক যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে 'ক্ষমতায়ন' ও 'মানবীয় উন্নয়ন' -কে সংশ্লেষিত করে গণ-অংশগ্রহণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ It is at this point that the concept of participation as empowerment comes close to the notion of development as fulfilment of human potential and capabilities (Ghai, 1988: 4) । এ ধরনের সংজ্ঞায়নের যথার্থতা বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতার জন্য জরুরী। বিশেষ করে সমন্বিত স্থানীয় উদ্যোগের জন্য গণ-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে[২] ঃ

(১) Sharing of power and resources;

(২) Deliberate efforts by social groups to determine their destinies;

(৩) Opening up of opportunities from below; and

(৪) Democratic and self-reliant organization for achieving the above objectives.

৫.৬ বাংলাদেশের মতো একটি সীমিত সম্পদ ও জনসংখ্যাধিক্যের দেশে দারিদ্র্য ও অভাবের অংশীদারিত্ব ছাড়া উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, অবাধ প্রতিযোগিতার নামে ব্যষ্টিস্বার্থকে চরিতার্থ করার অবারিত সুযোগ প্রদান টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করতে বাধ্য। সুতরাং খামার গৃহস্থালী, সম্পদ ও সাংগঠনিক সক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কের পুনর্কাঠামোদ্ধকরণ প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা, সমতা ও টেকসই অবস্থা অর্জনের জন্য ন্যূনতম সামষ্টিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য সম্পদের প্রত্যাশিত বন্টন ও বিকাশের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। একারণেই বলা হয়ে থাকে যে, এদেশে ক্ষুদ্রমাত্রার সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন। আর এধরনের উদ্যোগের মাধ্যমেই গণ-অংশগ্রহণকেও উদ্দীপিত করা যায়।

৫.৭ সে অর্থেই গণ-অংশগ্রহণ একদিকে পূর্বশর্ত অন্যদিকে উৎপাদন; যা, (১) প্রান্তিকজনদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, (২) অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহারকে

সংগঠিত করতে পারে, এবং (৩) প্রতিবেশকে রক্ষা করতে পারে। এযাবৎকাল আমলাতান্ত্রিক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থে প্রণীত সম্প্রসারণ কর্মসূচী, বিতরণ ব্যবস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবিবেচিত প্রসারণ ও লাগামহীন বেসরকারী সংগঠনের নিয়োজন দ্বারা উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চাওয়া হয়েছে। Misra (1985 : 80-81) বলেন, "Whatever institutions are conceived and created with the intention of benefitting the poor, ultimately tend to be dominated by the richer group and are utilized mainly for their benefit. How to mobilize the poor sections of the areas and enable them to take due and effective share in the existing resources and participate more actively in development activities of the rural areas seems to be the crucial questions".সত্যিকার অর্থে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) উন্নয়ন প্রশাসন, কৃষির আধুনিকীকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থানীয় সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৮ উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ একটি দীর্ঘকালীন প্রতিষ্ঠান হলেও সমকালীন প্রয়োজন ও অভিমুখীনতার অভাব এখানে অত্যন্ত তীব্র। এ পর্যায়ে যত ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা বিভিন্ন আমলে নেয়া হয়েছে সেগুলো আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের নেতৃত্বদানকারী প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আস্থা লাভে সক্ষম হয় নাই।[৪] এর মূল কারণ মনে হয় সমস্যার শেকড় অনুসন্ধানে ব্যর্থতা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রামীণ পুনর্গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দ্বিধা। কাঠামোগত বাধা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাব ও লক্ষ্যদল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে কর্মক্ষম করতে পারেনি; বরং এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর একটি স্থানীয় প্রান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যার সরকারমুখীনতা তেমনি অবিচল; যেমন সরকারের সাথে কায়েমী স্বার্থের নিগূঢ় বন্ধনও অনবদ্য।

৫.৯ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্য থেকেও সমন্বিত স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুপারিশ এসেছে। বেশ কিছু গ্রাম গবেষণা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে এসব সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক গবেষণাজাত সুপারিশকে শাসকমহল গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনবোধ করেননি (দেখুনঃ Abdullah, et al. 1977; Siddiquee, 1980; Januzzi & Peach, 1990) UNDP একটি রিপোর্টে সম্প্রতি মন্তব্য করেছে যে, মানব উন্নয়নে ব্যর্থতা অংশত জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কমিটমেন্টের অভাব ও অংশত তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত গণ-অংশগ্রহণের অভাবের ফলশ্রুতি। টেকসই-সক্ষমতা (Sustainable efficiency) অর্জনের জন্য সমতাসংক্রান্ত বিবেচনা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশল দরকার (UNDP, 1990:3)।

৫.১০ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনের কথা অনেক আগে থেকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। Dumont বলেছেন, "Nor democracy neither socialism is possible without

giving much real power to the majority of the people especially at village level. Some strong organization is badly needed at village level, with economic and level process (1973)[৫]। " Stepanek (1979 : 152) বলেন, "Civil service intervention at village level should be gradually curtailed not only because it has been ineffective but because, with the broadening of economic opportunities, the village as a whole should participate in productive process.[৬]"

৫.১১ বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন যে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে তাতে করে উন্নয়ন ভাবনায় মানবীয় উপাদানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মানবীয় সামর্থের সার্থক পরিস্ফূটনের জন্য যথাযথ প্রতিষ্ঠানও একটি উপলব্ধ প্রয়োজন। আমরা যে সামাজিক-পরিবেশতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম তাও অংশগ্রহণের প্রকৃতি, লক্ষ্য পরিধি ও প্রতিষ্ঠানের রূপ সম্পর্কে অনেকটা ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-গবেষক কর্তৃক প্রদত্ত 'কমিউনাইজেশন' বা 'কালেকটিভাইজেশন' সংক্রান্ত সুপারিশসমূহও যথেষ্ট মূল্যবান নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।[৭] কিন্তু এসব সুপারিশও সাধারণভাবে সামাজিক বিজ্ঞান-প্রসূত ধ্যান-ধারণাকে খুব কমই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল্য দেয়া হয়েছে। বরং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বদলে বেসরকারী সংগঠনের উপর নির্ভরশীলতাকেই আপাত-উদ্ধার হিসেবে পরিগণনা করা হয়েছে। সরকার অন্তত বেসরকারি সংগঠনসমূহকে একটি মডেল অন্বেষণের জন্য সমন্বিতভাবে প্রকল্পগ্রহণ ও প্রয়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করতে পারতো কিন্তু তা হয়নি। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতায় স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশানুগ উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি কতটুকু আশার আলো দেখতে পাবে তা সত্যিই অনিশ্চিত।

৫.১২ এছাড়া, এমন আশাও করা যায় না যে, সরকার বেসরকারি সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। বলা বাহুল্য, সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে; বেসরকারি সংগঠন সুবধাবিধানকারী হিসেবে সাহায্য করতে পারে মাত্র। এমন উক্তি বেসরকারী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পাওয়া যায় যে, "Given their limited reach and authority, dissemination of new approaches across the country should be the task of the government" (UNDP, 1993 : 71)। একথা সহজ অনুধাবনীয় যে, বেসরকারি সংগঠন নতুন 'কনসেপ্ট,' 'প্রাকটিস' ও 'ডিজাইন' প্রদান করার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারলেও সম্প্রদায়ভিত্তিক বহুমুখী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষমতা রাখে না।[৮]

৬.০ উপসংহার

বৃহত্তর সামাজিক-পতিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি পরিবেশগত সংকটকে টেকসই কৃষি উন্নয়ন, উদ্ভাবনমূলক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে গণ-অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার মতো বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবার অবকাশ দেয় না। বরং সীমিত

সম্পদের উৎপাদনমুখী ও সংরক্ষণমূলক ব্যবহারের জন্য সমষ্টিগত উদ্যোগেরই ইঙ্গিত দেয়। এক্ষেত্রে দুরবস্থাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর গণ-অংশগ্রহণ, সমতাবিধান ও ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ ধরনের সমন্বয়, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও গণ-অংশগ্রহণভিত্তিক স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নে সহজেই অবদান রাখতে পারে। তবে সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য যে শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজন তা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐকমত্যের মাধ্যমেই অর্জন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অভিজ্ঞমহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বেসরকারী সংগঠনের অর্জিত সাফল্যের নিরিখে একদিকে যেমন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে, তেমন জাতীয় পর্যায়ে সংলাপও অত্যন্ত জরুরী। ব্যাপারটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শাসক ও অশাসক রাজনৈতিক দলসমূহ ও বিশেষজ্ঞমহল যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন, জাতির জন্য তা ততই মঙ্গল বয়ে আনবে।

টীকা

১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নীতির কিছু অতীত ভুল চিহ্নিত করা হয় ঃ (১) ওপর থেকে প্রতিষ্টান চাপিয়ে দেয়া এবং তাকে আমলাতন্ত্রেরই সম্প্রসারণ হিসবে চিহ্নিত করা; গণ-অংশগ্রহণ নয়; (২) সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা; (৩) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানকে বাইরের সম্পদ বিতরণ ও ব্যবহারের এজেন্সি হিসেবে প্রত্যক্ষ করা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগঠিতকরণের জন্য নয় (দেখুন ঃ Abdullah, 1974)।

২) Drillon and Steitel (1987) প্রথম তিনটি পয়েন্টকে ক্ষমতায়নের উপাদান হিসেবে গণ্য করেন। Ghai (1988 : 4) মনে করেন অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে দরিদ্রদের সংগঠন প্রয়োজন যা চতুর্থ উপাদান হিসেবে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩) Attwood (1992) মনে করেন রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাঝামাঝি একটি মধ্যপথও রয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সমবায়কে তেমন একটি সক্ষম পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।

৪) Wahhab (1988 : 222) মনে করেন যে স্থানীয় সরকারের কাঠামো ও কার্যকলাপ সম্পদকে সাংবিধানিক বিধান থাকা উচিৎ।

৫) Abdullah and Engellhard (1993 :16) একটি প্রবচনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ "There is no democracy without local development." তিনি এর সাথে যুক্ত করেন ঃ "Without, or with little, concern for the environment"।

৬) Abedin (1981) মন্তব্য করেন যে, স্বনির্ভর হবার জন্য 'The cooperatives, as community institutions, will have to take full responsibility of resource allocation, production, consumption and distribution. These will deal with economic, social, cultural and even with political aspcts of rural life,'

৭) Abdullah (1974) অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও বৃহৎ প্রকৃতির সমবায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। অবিচ্ছিন্ন এলাকার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সমবায়টি 'firm-farm' হিসেবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৮) Khan and Steward (1993) একটি নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, পরিপূর্ণ গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান অর্জনকে একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

ABDALLAH, T. B. and Engelhard, P. 1993 *The Urgency of Fighting Poverty for Democracy and the Environment*. Geneva : United Nations Non-Government Liaison Service.

ABDALLAH, A. 1974 *Institution-Building in Agriculture : Implicit Social Theory in the First Five Year Plan*. Political Dconomym 1, 1, 193-200.

ABEDIN, Z. 1982 *The Prospects of Agrarian Reforms in Bangladesh*. The Journal of BARC, 11, 1 & 2, 16-29.

ALI, YOUSSOUF 1991 *Towards Sustainable Development : Fisheries Resource of Bangladesh*. Dhaka : IUCN/NCSB.

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1991 *Population and Natural Resource Management : Key Issues and Possible Actions (Paper No. 6*. Manila.

ATTWOOD, D.W. 1990 *State vs. Local Control in Common Resource Management : A Comparative Analysis.Sociological Bulletin* 41, 1 & 2, 1-17.

CHOWDHURY, K. R.and Bhuiyan, A. H. 1990 *Environmental Processes Flooding, River Erosion, Siltation and Accretion Physical Impacts*. In : Rahman, A. A. et al. eds, Devironmental Aspects of Surface Water System of Bangladesh. Dhaka : University Press Ltd.

CHOWDHURY, M. S. U. 1993 *Importance of Natural Resource Management for Sustainable Agricultural Development : Bangladesh Context*. Dhaka : Bangladesh Agricultural Research Council.

DANIDA 1989 *Environmental Profile : Bangladesh*. Copenhagen.

DEAN, P. B. & Treygo, W. 1989 *The Environment and Development in Bangladesh*. Dhaka : Canadian International Development Agency.

DUMONT, R. 1973*Problems and Prospects for Rural Development in Bangladesh*. Dacca : The Ford Foundation.

GHAI, D. 1990 *Participatory Development : Some Perspectives from Grassroots Experiences*. In : Griffin, K. and knight, J. eds. *Human Development and International Development Strategy for the 1990s*. London : Macmillan.

HUSSAIN, M. 1990 *Population and Environment Inter Relationships in Bangladesh*. In : Mahbub, A. Q. M. ed. *Proceedings of the Seminar on People and Devironment in Bangladesh*. Dhaka : UNDP/UNFPA.

ISLAM, N. 1990 *Impact of Demographic Pressure on Biomass Resource and Related Environmental Issues*. In : Mahbub, A. Q. M. ed. op. cit.

ISLAM, S. 1990 *The Declining Soil Quality*. In : Rahman, A. A. et al. eds. op. cit.

JANUZZI, F.T. & PEACH, J.T. 1990 *Bangladesh : A Strategy for Agrarian Reforms*. In : Posterman R. L. et al. eds, *Agrarian Reform and Grassroot Development*. London : Lynne Rienner Publishers.

JAHANGIR, B. K. 1979 *Differentiation, Polarization and Confrontation in Rural Bangladesh*. Dhaka : Cenre for Social Studies.

KHAN, N. & STEWART, E. 1993 *Institution Building and Developmen in Three women's Organization of BRAC : Participation, Ownership & Autonomy*. Grassroots, 3, 9, 1-20.

MAHMUD, I. 1991 *Towards Sustainable Development : Industrial Pollution in Bangladesh*. Dhaka : IUCN/NCSB.

MISRA, R.P. 1985 *Rural Development : Capitalist and Socialist paths (Vol. One) New Delhi* : Concept publishing Co.

POOKPAKDI, A. 1993 *Sustainable Agricultural Development with Emphasis on Small Farmers*. Farm Management Notes, 16, 1-15.

RAHMAN, A. 1989 *Peasants and Classes*. Dhaka : University Press Ltd.

RASHID, H. 1991 *Geography of Bangladesh*. Dhaka : University Press Ltd.

STEPANEK, J.F. 1979 Bangladesh Equitable Growth? New York : Pergamon Press.

VIVIAN, J. M. 1991 *Greening at the Grassroots : People's Participation in Sustainable Development*. Geneva : UNRISD.

WAHHAB, M.A. 1988 *Bangladesh Local Government : Endless Search for Newer Structure*. The Journal of Political Science Association. 1, 20-24.

WESTERGAARD, K. 1983 *Pauperization and rural women in Bangladesh*. Comilla, Bangladesh : BARD.

WORLD RESOURCE INSTITUTE 1990 *Bangladesh : Environment and Natural Resource Assessment*, Washington.

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত

কাজী হাসান ইমাম*

১.০ ভূমিকা

আদিতে বিংশ শতাব্দীর মত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উৎকর্ষ ছিলনা। কিন্তু গুহা-মানবের সমাজ ব্যবস্থা থেকেই 'পরিবেশ ভাবনা' সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নিয়তসঙ্গী। কালিক ও স্থানিক প্রেক্ষাপটে 'পরিবেশ বিবেচনা'র ধরন ভিন্ন হলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মানুষ 'পরিবেশ'কে গুরুত্ব দিয়েছে। নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কখনো কখনো মানুষকে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থার তাগিদে মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে আসছে। কখনো আবার নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিতে প্রয়াস পেয়েছে।

সভ্যতার বহমান এ অগ্রযাত্রায় আজ 'পরিবেশ ভাবনা' বিশ্বমানবকে শঙ্কিত করে তুলেছে। কালের অবধারিত প্রবাহে ভবিষ্যতের বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য মানুষ খুঁজে ফিরছে অর্থনীতি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক ও সুষ্ঠু সমন্বয় *(Zellentin, 1987, পৃ, ১১)*। পরিবেশ উন্নয়নে বিশ্ব জাগরণের বর্তমান ধারায় এসেও উন্নয়নশীল অনেক দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবেশ-সচেতনতার অভাব লক্ষ্যণীয়। মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে বিষয়বস্তুগত ধারণা পরিষ্কার করা যেতে পারে।

১.১ পরিবেশ কী এবং কেন ?

সহজ কথায় আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, আমাদের অস্তিত্বসহ সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় পরিবেশ হচ্ছে, *"The sum total of all*

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

conditions and influences that affect the development and life of organisms," (Aminullah, 1992, পৃ, ১)। পরিবেশকে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশকে জীব ও জড় হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। এভাবে অসংখ্য দৃষ্টিকোণে পরিবেশকে দেখা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে পরিবেশের সকল উপাদান একে অপরের সম্পূরক ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। পরিবেশ মানুষের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক কাজ করে ঃ

ক. বাতাসসহ মানুষের থাকার জায়গা দেয় এবং সেসব আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র সরবরাহ করে, যা মানুষের জীবনকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করে;

খ. পরিবেশ হচ্ছে কৃষি, খনিজ, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের উৎস, যা মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরিহার্য; এবং

গ. পরিবেশ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সব আবর্জনা গ্রহণকারী হিসেবে কাজ করে এবং এর ব্যাপক অংশের পরিশোধন নিশ্চিত করে।

১.২ পরিবেশ দূষণ কী এবং কীভাবে ঘটে ?

যখন পানি, বাতাস ও মাটিসহ পরিবেশের কোন উপাদানের এমন কোন ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাৎক্ষণিক বা পরবর্তীকালে, স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে জীবজগতের ওপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে, তখন এ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহ অর্থাৎ পরিবেশ দূষকসমূহকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

ক. শক্তি বিষয়ক দূষকসমূহ ঃ যেমন শব্দ, তাপ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ইত্যাদি;

খ. রাসায়নিক দূষকসমূহ ঃ যেমন জৈব বা অজৈব, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থসমূহ;.

গ. জীব দূষকসমূহ ঃ যেমন বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবীসমূহ ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া জীবন-চক্র, খাদ্য-চক্র, পানি-চক্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় আবর্তিত হতে পারে। মূলত প্রাকৃতিক বা জীব জগতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, তাকে প্রধান

চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে দূষণের শ্রেণীবিন্যাসসহ প্রধান দূষকসমূহ ও দূষণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

পরিবেশ দূষণের শ্রেণী	প্রধান দূষকসমূহ/দূষণ প্রক্রিয়া
ক. পানি দূষণ	জৈব আবর্জনা, কৃত্রিম জৈব পদার্থ, অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, পানিবাহিত পলি ও তলানী, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, উষ্ণ পানি, তেল ইত্যাদি।
খ. মাটি দূষণ	নগরায়ন, শিল্পায়ন, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় ও খনিজ আবর্জনা, বনোজাড়, খনিজ সম্পদ আহরণ ও পরিবহন, পারমাণবিক দুর্ঘটনা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
গ. বায়ু দূষণ	কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফার, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন, সালফারের অক্সাইডসমূহ, ওজন ইত্যাদি।
ঘ. শব্দ দূষণ	যানবাহন, কলকারখানা, নির্মাণকাজ, পরিবহন ইত্যাদি।

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ কী এবং কেন ?

পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ভারসাম্য অবস্থা নিশ্চিত করে। মূলত পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে পরিবেশকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যময় অবস্থায় রক্ষণকে বোঝায়। মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ড পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। মানুষের এই কর্মকান্ড স্থবির করে দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাহলে সভ্যতার অগ্রযাত্রা স্থবির হয়ে পড়বে। কিন্তু মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণকে একটি সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব এবং তাতে উন্নয়ন ব্যাহত হবে না। বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবেশ সংরক্ষণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পর্যাপ্ত পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যতিরেকে উন্নয়ন হবে ধ্বংসমুখী, উন্নয়ন ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে সম্পদের অপর্যাপ্ততা দেখা দেবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে *(The World Bank, 1992, পৃ, ২)* ।

২.০ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যার স্বরূপ

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, প্রকৃতির ধারণ ক্ষমতা অসীম এবং মানুষ পরিবেশকে যতই দূষিত করুক না কেন, প্রকৃতি তার নিজস্ব

নিয়মে তা পরিশোধন করতে সক্ষম। শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে মানুষের এ বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন আসে। পরবর্তীকালে এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এবং বিশেষজ্ঞরা প্রকৃতির সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। নব্বুইয়ের দশকে এসে বিশেষজ্ঞরা অনুধাবন করেন যে, 'পরিবেশ বিবেচনা' কে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়।

মানুষের অর্থনৈতিক তৎপরতা প্রকৃতিকে জয় করার অংশ হিসেবে জৈব পরিমন্ডলের ওপর প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে। বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নজিরবিহীন উদ্ভাবন পরিবেশকে দূষিত করছে। শিল্প ও অন্যান্য বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষমতা প্রকৃতি প্রায় হারাবার পথে। প্রতি মিনিটে মরুভূমি গ্রাস করে নিচ্ছে ৪৪ হেক্টর উর্বর ভূমি, ২০ হেক্টর বনভূমি হচ্ছে বিরান *(পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ পৃ. ৭)*। অক্সিজেন তৈরীর অন্যতম স্থান গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে *(সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৬)*।

১৯৮৫ সালে ভূপালের (ভারতে) *ইউনিয়ন কার্বাইড* রাসায়নিক কারখানা থেকে বিষাক্ত *মিথাইল আইসো সায়ানাইড গ্যাস* নির্গমনের দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় আড়াই হাজার লোক মারা যায় এবং দু' লক্ষ লোক বিষক্রিয়ার শিকার হয়, যাদের অনেকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে *(পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ৬)* ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের (সোভিয়েত ইউনিয়ন) পারমাণবিক চুল্লীর বিষ্ফোরণজনিত ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় কমপক্ষে সাড়ে তিন লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়। এদের অনেকেই আগামী দু' দশকের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে চলেছে। দুর্ঘটনার দু' চার বছর পরেও চেরনোবিল ও তার আশে-পাশের জমি আবাদযোগ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে এ দুর্ঘটনায় গোটা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কৃষিজমি ও কৃষিপণ্য দূষিত হয়েছিল এবং এর জের দীর্ঘ মেয়াদী *(Zellentin, 1987, পৃ.১৫-১৬)*। ইউরোপীয় শিল্পনির্গত বায়ু দূষণে সৃষ্ট অম্লবৃষ্টির কারণে ব্যাপক এলাকা জুড়ে বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে *(Renner, 1987, পৃ. ১২৮; Barner, 1983, পৃ. ৯৪-৯৫)*। পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী মেক্সিকো এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিপর্যয়কর মাত্রায় দূষণের ফলে এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, তন্দ্রালুতা, চোখ জ্বালাপোড়া, মাথা ঝিঁঝি করার মত অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দূষণের কারণে নগরবাসীর মধ্যে ক্যান্সার ও হৃদরোগের আশঙ্কা বেড়ে গেছে। শিশুদের জ্ঞানার্জনে অক্ষমতা ও স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে *(পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ৬)*।

জনসংখ্যা, পরিমিত বনসম্পদের অবস্থা এবং দূষণমাত্রা এই তিনটি চলকের ওপর নির্ভর করে নিউজ উইক পত্রিকা বিশ্বের ৩০টি দেশ চিহ্নিত করে, যাদের পরিবেশগত অবস্থা সবচেয়ে খারাপ অথবা সবচেয়ে ভাল। এদের মধ্যে আবার বাংলাদেশ, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ভারত, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন্‌স ও জায়ারের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে অবক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয় এবং অন্যদিকে রিপোর্টটি কোষ্টারিকা, ফ্রান্স, ইসরাইল এ তিনটি দেশের পরিবেশগত অবস্থাকে সবচেয়ে ভাল বলে চিহ্নিত করে (সারণী-১)। বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন প্রধান প্রধান পরিবেশ সমস্যার কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও উৎপাদন পরিণতি সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেছেন (সারণী-২) তা প্রতিটি পরিবেশ সচেতন মানুষকে উদ্বিগ্ন করে *(The World Bank, 1992, পৃ. ৪)*।

১৯৮৮ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহতম বন্যা *(Adnan, 1994, পৃ. ১৮৭)* ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়, সামগ্রিক পরিবেশগত অবনয়নের ফল বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন। সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র তিনমাস ব্যাপী খরার ফলশ্রুতিতে কৃষিজ উৎপাদনের ৩১ শতাংশ হ্রাস পায়, যা সে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মাত্রাতিরিক্ত দূষণে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকির কারণে উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সৈকত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া *গ্রীনহাউস* প্রতিক্রিয়ার কারণে *(Prins, 1990, পৃ. ৭২৪-৭২৫)* বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া *(Environment News, 1993, পৃ. ১; পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ৮৩-৯৩)*, ওজন স্তরের ক্ষয় ও মরুময়তা বৃদ্ধি (পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ৯৪-১০৩) এ সবই এক ব্যাপক পরিবেশগত অবনয়নের চিত্র।

সারণী–১ ঃ 'নিউজ উইক'এর নিরূপণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিবেশ অবক্ষিত/সবচেয়ে পরিবেশসম্মত ৩০টি দেশের তালিকা

(বিশ্ব পরিবেশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টিকারী তিনটি পরিমাপের ওপর নির্ভর করে নিরূপিত ঃ x = খুব খারাপ, √ = খুব ভাল, * = মধ্যম)

দেশের নাম	বিশেষ পরিবেশ সম্মত/পরিবেশ অবক্ষিত দিকসমূহ	পরিমাপ উপাদান		
		জনসংখ্যা	বন	দূষণমাত্রা
বাংলাদেশ	আদি চিরহরিৎ অরণ্যের বিলুপ্তি, ফলশ্রুতিতে ব্যাপক বন্যা; গ্রামীণ বসতির ৯৭% স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থাহীন।	x	x	x
ব্রাজিল	ষষ্ঠ মাথাপিছু উচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী, বনোজাড় ভর্তুকী কিছুটা হ্রাস করেছে।	√	x	x
কানাডা	নিম্ন জ্বালানী দক্ষতা, অম্লবৃষ্টির সমস্যা পীড়িত তবুও চিমনী-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কয়লার ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে।	√	x	x
চীন	তৃতীয় মাথাপিছু উচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী (বিশ্বের মোট পরিমাণের ৯.১%), ব্যাপকভাবে বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত, শ্বাসরুদ্ধকর নগর দূষণ।	√	x	x
কঙ্গো	বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব প্রকট; চিরহরিৎ অরণ্যের ৬৮% কর্তনের জন্য নির্ধারিত; মহিলা প্রতি ৫.৮ জন শিশু সন্তান।	x	x	x
কোস্টারিকা	জৈব-বৈচিত্র ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের প্রবর্তক; মহিলা প্রতি ৩.৩ সন্তান।	√	√	√
চেকোশ্লো-ভাকিয়া	পানি ও শহরাঞ্চলে দূষণের উচ্চহার; গ্রামীণ মোট জলাশয়ের ৯০% দূষিত।	√	x	x
মিশর	অতিমাত্রায় কীটনাশক ভর্তুকী, ফলশ্রুতিতে রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ও দূষণ ঘটে।	x	*	x

দেশের নাম	বিশেষ পরিবেশ সম্মত/পরিবেশ অবক্ষিত দিকসমূহ	পরিমাপ উপাদান		
		জনসংখ্যা	বন	দূষণমাত্রা
ইথিওপিয়া	অতি বর্ষণে বছরে ১ বিলিয়ন টন টপ-সয়েল ক্ষতিগ্রস্ত; পরিষ্কার পানির তীব্র সংকট; মহিলা প্রতি ৭.৫ সন্তান।	X	X	X
ফ্রান্স	আণবিক শক্তি নির্ভর, গ্রীনহাউস এমিশন হ্রাসকারী (বিশ্বের মোট পরিমাণের ১.৫%), মহিলা প্রতি ১.৮ সন্তান	√	√	√
জার্মানী	অম্লবৃষ্টির কারণে বনাঞ্চল নষ্ট হচ্ছে; ৩৫,০০০ পতিত বিষক্রিয় বর্জ্যক্ষেত্র; উচ্চ জ্বালানী দক্ষতা।	√	X	X
ভারত	পঞ্চম উচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী; প্রায় সমুদয় আদি চিরহরিৎ অরণ্য বিলুপ্ত; মহিলা প্রতি ৩.৯ সন্তান।	X	X	X
ইন্দোনেশিয়া	১০,০০০ মাইল প্রবাল-প্রাচীর ধ্বংসের মুখে; সমৃদ্ধ জলাভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণে পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে।	√	X	X
ইসরাইল	সূর্য শক্তি ও মরু-কৃষির প্রবর্তক; মহিলা প্রতি ২.৯ সন্তান।	√	√	√
ইতালী	মারাত্মক *এডিয়াটিক* দূষণ; জ্বালানীতে দক্ষ; মহিলা প্রতি ১.৩ সন্তান; নাইজেরিয়াতে বিষক্রিয় বর্জ্যের আস্তাকুঁড় করেছে।	√	√	X
জাপান	চতুর্থ উচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী; বিপন্ন বন্যজীবনে পদচারণা, জ্বালানীতে দক্ষ।	√	X	√

দেশের নাম	বিশেষ পরিবেশ সম্মত/পরিবেশ অবক্ষিত দিকসমূহ	পরিমাপ উপাদান		
		জনসংখ্যা	বন	দূষণমাত্রা
কেনিয়া	শহরের বাইরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, বন্যজীবন রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে; মহিলা প্রতি ৬.৭ সন্তান।	x	x	x
মাদাগাস্কার	বনোজাড়ের উচ্চহার; বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট; মহিলা প্রতি ৬.৬ সন্তান।	x	x	x
মালয়েশিয়া	প্রধানতঃ জাপানে রপ্তানীর কারণে বনোজাড়ের উচ্চহার; গত শতাব্দিতে প্রায় অর্ধেক জলাভূমিই নষ্ট হয়ে গেছে।	x	x	√
মেক্সিকো	মারাত্মক বায়ু ও পানি দূষণ, বার্ষিক বনোজাড়ের পরিমাণ ১.৫%।	x	x	x
নাইজেরিয়া	২০০০ সাল নাগাদ পূর্ণ বনোজাড় সম্পন্ন হবে; শহরের বাইরে বিশদ্ধ পানির সংকট, মহিলা প্রতি ৬.৫ সন্তান।	x	x	x
নরওয়ে	জলপথ ও বনাঞ্চল অম্লবৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, বাণিজ্যিক জ্বালানী দক্ষতা নিম্ন।	√	x	√
ফিলিপাইনস্	মাত্রাতিরিক্ত বনোজাড়ের কারণে ব্যাপক বন্যা; ২০১০ সাল নাগাদ কোন কুমারী-বনাঞ্চল থাকবে না।	x	x	x
পোল্যান্ড	মাত্রাতিরিক্তভাবে দূষিত, অনিয়ন্ত্রিত এলাকায় বছরে ২০ *মিলিয়ন টন* বিষক্রিয় বর্জ্য *ডাম্প* করে।	√	x	x
সৌদি আরব	জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তির নেতৃস্থানীয় প্রতিপক্ষ; মহিলা প্রতি ৭.১ সন্তান।	x	√	x

দেশের নাম	বিশেষ পরিবেশ সম্মত/পরিবেশ অবক্ষিত দিকসমূহ	পরিমাপ উপাদান		
		জনসংখ্যা	বন	দূষণমাত্রা
থাইল্যান্ড	১৯৬১–১৯৮৫ পর্যন্ত ৪৫% বনাঞ্চল হারিয়েছে; ব্যাংককের বাড়ন্ত শিশুকে বিষক্রিয় করতে নেতৃত্ব দিচ্ছে।	√	x	x
প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন	দ্বিতীয় উচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী, মোট পরিমাণের ১৩.৬% ভূমি ও সমুদ্র উভয় স্থানেই টনের পর টন বিষক্রিয় বর্জ্য *ডাম্প* করেছে।	√	√	x
ইউনাইটেড কিংডম	জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তি সম্পর্কিত বিতন্ডার নেতৃত্ব দিয়েছে; জ্বালানী দক্ষতা ১৯৭০ থেকে ৩০% উন্নত করেছে।	√	√	x
যুক্তরাষ্ট্র	সর্বোচ্চ *গ্রীনহাউস এমিশন* সৃষ্টিকারী, বিশ্বের মোট পরিমাণের ১৭.৮% ; বনোজাড় ভর্তুকী দেয়।	√	x	x
জায়ার	বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে বিশ্বের ২৫টি খারাপতম দেশের একটি, মহিলা প্রতি ৬.১ সন্তান।	x	x	x

উৎস ঃ *Earth at the Summit, Special Report, June 1,1992.* পৃ.. ১৫।

সারণী –২ঃ পরিবেশ সমস্যার প্রধান স্বাস্থ্য ও উৎপাদন পরিণতি

পরিবেশ সমস্যা	স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব	উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব
পানি দূষণ ও পানির অভাব	পানি দূষণের কারণে প্রতি বছর ২ মিলিয়ন লোক মারা যায় এবং লক্ষ কোটি রোগাক্রমণের ঘটনা ঘটে; পানির অভাবের কারণে নিম্নস্তরের পারিবারিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়।	সম্পদের নিম্নগতি; বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে গ্রামীণ পরিবারের সময় এবং পৌর এলাকায় অতিরিক্ত করের প্রয়োজন হয়; অতিমাত্রায় দূষণের ক্ষেত্রে পূর্বানুবৃত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে; পানি স্বল্পতার কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।
বায়ু দূষণ	অগণিত তীব্র এবং দীর্ঘ মেয়াদী স্বাস্থ্য-ক্ষতির কারণ ঘটায়; শহর এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে প্রতিবছর ৩-৭ লক্ষ অপরিণত মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় অর্ধেক পরিমাণ শিশু মেয়াদী কফ--আক্রান্ত হয়; গ্রামীণ এলাকার ৪০০-৭০০ মিলিয়ন লোক, প্রধানত নারী ও শিশু, গৃহমধ্যের ধূম্রযুক্ত বায়ুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	বিপর্যয় সময়ে যানবাহন ও শিল্প কার্যক্রম সীমিত করতে হয়; বন ও জলাশয়ের ওপর অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব নেমে আসে।
কঠিন ও বিপজ্জনক বর্জ্য	আবর্জনা পচনের মাধ্যমে রোগের বিস্তার ঘটে, নর্দমা বন্ধ হয়; বিপজ্জনক বর্জ্যের ঝুঁকি বিশেষতঃ স্থানীয় কিন্তু প্রায়শই মারাত্মক।	ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের দূষণ ঘটে।
মৃত্তিকার অবক্ষয়	অবক্ষিত মৃত্তিকার কারণে গরীব চাষীদের পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়; খরার প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।	গ্রীষ্মমন্ডলীয় মাটিতে শস্য উৎপাদন ক্ষতি *জিএনপি*-র ০.৫-১.৫ শতাংশ, জলাধার ও নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস এবং অন্যান্য *হাইড্রোলিক* বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিবেশ সমস্যা	স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব	উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব
বনোজাড়	স্থানীয় বন্যা, যা মৃত্যু ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।	টেকসই-স্থৈতিকতা হ্রাস, ভূমিক্ষয় রোধ, পানি স্তরের স্থায়ীত্ব, কার্বন যৌগের পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
জৈব-বৈচিত্র	নতুন ঔষধের স্থৈতিকতা হ্রাস	বাস্তব্যরীতিতে ভারসাম্যের অভাব ঘটে; প্রজনন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বায়ু মন্ডলীয় পরিবর্তন	Vector-borne রোগে সম্ভাব্য পরিবর্তন, জলবায়ু সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, ওজন স্তরের ক্ষয়ের কারণে অতিরিক্ত চর্ম ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের সম্ভাবনা।	সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি উপকূলবর্তী বিনিয়োগ নষ্ট করবে; কৃষি উৎপাদনে আঞ্চলিক পরিবর্তন আসবে; সামুদ্রিক খাদ্য-চক্র ভেঙ্গে পড়বে।

উৎস: *The World Bank : World Development Report 1992; Development and the Environment, Oxford University Press, New York, 1992,* পৃ. ৪.

পরিবেশগত এ দৃশ্যমান ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়াও অনেক দিক রয়েছে, যা প্রতি মুহূর্তে ধীরে ধীরে আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে অনেক অপরিণত জীবন *(সিদ্দিকী, ১৯৯৪ পৃ. ৮-৯)*। আশির দশকে ইউরোপের পরিবেশ সচেতন মায়েদের উদ্বিগ্ন চেহারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে। তারা তাদের শিশুদের সব্জি খাওয়াতে ভয় পেতেন—না জানি, সব্জিতে যদি তেজস্ক্রিয়তা থাকে! বাড়ীর সামনের লনে বাচ্চাদের খেলার জন্য ছেড়ে দিতে ভয় পেতেন—মাটি যদি তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে! একইভাবে বিশ্বের পরিবেশ সচেতন মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়ানো প্রশ্ন জাগে—আমাদের খাদ্য-চক্র পরিবেশগতভাবে কতখানি নিরাপদ! পানি-চক্র কতটুকু নিরাপদ! যেহেতু এ বিষয়গুলো ততটা দৃশ্যমান নয়, তাই আমরা, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা অন্তত বেঁচে থাকার নেশায় বুঁদ হয়ে এ সকল জীবনের হুমকি সৃষ্টিকারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলোকে গ্রাহ্য করছি না, এমনকি নানাভাবে ত্বরান্বিত করছি।

৩.০ বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যার স্বরূপ

অনেকে মনে করেন, শিল্পায়নই পরিবেশগত অবক্ষয়ের মূল কারণ। বাংলাদেশ যেহেতু শিল্পে অনগ্রসর, সুতরাং এখানকার পরিবেশের অবস্থা ততটা খারপ নয়। বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান দিকগুলো

এবং তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র সারণী–৩ এ উপস্থাপিত হয়েছে। সারণী–৩ এর বর্ণানুসারে পরিবেশ অবক্ষিত প্রধান এলাকাসমূহ মানচিত্র–১ এ দেখানো হয়েছে। মানচিত্রে গোলকের মধ্যে ব্যবহৃত নম্বরসমূহ সারণী–৩ এ উপস্থাপিত এলাকাভিত্তিক ক্রমিকের নির্দেশক। পূর্ববর্তী পরিচ্ছদের আলোচনাতেও বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম পরিবেশ অবক্ষিত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (সারণী–১)। অনেকের মতে, দারিদ্রই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরিবেশগত অবক্ষয়ের প্রধান কারণ *(Rana, 1990. পৃ. ৯৭)*। ব্যাপক প্রসারমান দারিদ্র যে শুধুমাত্র উন্নয়নের সচল ধারাকে ব্যাহত করছে তাই নয়, বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত এলাকাসমূহ পরিবেশগত ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত *(পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ৪০)*। ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য, সীমিত সম্পদের ওপর অত্যধিক চাপ, প্রয়োজনীয় জ্বালানীর অভাব, দারিদ্র, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, অশিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বাংলাদেশের পরিবেশগত অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঘন ঘন বন্যা ও ঝড়–জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের নিয়তসঙ্গী। এ যাবতকালের ইতিহাসে দেখা গেছে, ফানেলাকার উপকূলীয় ভূমিরূপের কারণে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বেশির ভাগ সাইক্লোনই বাংলাদেশে আঘাত হানে। *(Imam, 1994, পৃ. ২০০–২০২)*। অবস্থানগত কারণে কালবৈশাখী ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ এখানে বেশি। প্রাকৃতিক ভূমিরূপ ও অবস্থান বাংলাদেশকে বন্যার আবাসস্থল করে তুলেছে। এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অসংখ্য মানুষ ও প্রাণি; দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিনষ্ট হয়; দূষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়; জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং দেশের কৃষিজ উৎপাদনে মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, জীবিকা ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কোনটিই যথাযথভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। অতিকর্ষণে ভূমিতে *টপ্–সয়েলের* আস্তরণ কমে যাচ্ছে, মাটিতে প্রয়োজনীয় জৈব উপাদানের অভাব দেখা দিচ্ছে; জমির উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন *(Islam, 1992, পৃ. ৫৮)*। সেচের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় উত্তোলনের কারণে প্রতিবছর স্থান বিশেষে পানির স্তর দু'থেকে আড়াই ফুট নিচে নেমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এই স্তর আহরণ ক্ষমতার নীচে নেমে গেছে। সেচ কার্যের কারণে মাটির গুণগত মান বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে *(Nishat 1993, পৃ. ৩)*। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করছে এবং এ ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে *(Nishat 1993, পৃ. ৩; সিদ্দিকী, ১৯৯৩, পৃ. ৯)*।

সারণী–৩ ঃ বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষিত প্রধান এলাকাসমূহ এবং প্রধান সমস্যাবলী

অবক্ষিত এলাকা	অবক্ষয়ের ধরন	নেতিবাচক পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া
১. মহানন্দা অববাহিকা	নদী ভরাট, ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক।	প্রায়শই বন্যা কবলিত এবং কখনো আবার খরাক্রান্ত, জনস্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা, মরুপ্রবণতা।
২. পশ্চিম-কেন্দ্রীয় বরেন্দ্র ভূমি	অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, খারাপ মাটি।	কৃষি উৎপাদন হ্রাস, মরুপ্রবণতা।
৩. মধ্য করতোয়া অববাহিকা	করতোয়া নদীর শুষ্কতা ও দো-ফসলী উপশী-ধান চাষের কারণে মারাত্মকভাবে সালফার ও জিঙ্ক স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।	ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, মৃত্তিকায় পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা, মরুপ্রবণতা।
৪. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকা	নদীর পশ্চিম-মুখ গতি (অবস্থান) পরিবর্তন, বন্যা পরবর্তী বালু-সঞ্চয়ন।	চর এলাকায় বিপুল পরিমাণ ভাসমান লোকের বসবাস; বন্যা পরবর্তী বালু-জমা প্রায়শই আবাদযোগ্য জমি নষ্ট করে দেয়, মরুপ্রবণতা।
৫. চলন বিল	*এফসিডিআই* প্রকল্পের কারণে এ সমৃদ্ধ জলাশয়টি এখন ধ্বংসের মুখে।	বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ জলাশয়; কিন্তু এখন প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হতে চলেছে।
৬. আত্রাই হুরাসাগর ড্রেইনেজ বেসিন	অপরিণামদর্শী বাঁধ নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা।	নদীর জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে; এলাকায় জলাবদ্ধতা মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

অবক্ষিত এলাকা	অবক্ষয়ের ধরন	নেতিবাচক পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া
৭. দক্ষিণ-পশ্চিম যশোর	বিশুদ্ধ পানি প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি।	ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গার প্রবাহ হ্রাস, শুষ্ক মওসুমে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি-প্রবাহ কমে গিয়ে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮. উত্তরাঞ্চলীয় খুলনা	বৃহৎ-অবয়বে চিংড়ি চাষ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, স্থান বিশেষে ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক।	কৃষকদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ, কৃষি উৎপাদন (বিশেষত ধান) হ্রাস, ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।
৯. খুলনা সিটি ও মংলা শহর	শিল্প দূষণ, জাহাজ থেকে তেল নিষ্কাশন *(Oil spills)*, নগর-জনাকীর্ণতা।	সামগ্রিকভাবে বসবাসকারীদের ওপর নেতিবাচক স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
১০. সুন্দরবন	লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বর্ধিষ্ণু মাত্রায় জাহাজের ময়লা তেল নিষ্কাশন, শিল্প-রাসায়নিক পদার্থ, অতিরিক্ত বনাহরণ।	সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মাথামরা রোগাক্রমণ, নানা কারণে জোয়ারের স্তর হ্রাস ও ঘন ঘন প্লাবন।
১১. পটুয়াখালী-ভোলা-নোয়াখালী চরাঞ্চল	জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার।	সামগ্রিকভাবে বসতি ও কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।
১২. গারো পাহাড়ী অঞ্চল	বনোজাড়।	আকস্মিক বন্যা, ভূমিক্ষয় এবং ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন হ্রাস।
১৩. টাঙ্গাইল	নদী ভরাট।	আকস্মিক বন্যা।
১৪. মধুপুর গড়	বনোজাড়, টিলাজমির অনুপযুক্ত ব্যবহার।	ভূ-উপরিস্থ মৃত্তিকার ক্ষয়।

অবক্ষিত এলাকা	অবক্ষয়ের ধরন	নেতিবাচক পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া
১৫. শীতলক্ষা নদী	ঘোড়াশাল, পলাশ ও ডেমরা শিল্প-স্থাপনা থেকে নদীতে বিষক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ নির্গমন।	জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি ও মৎস্য সম্পদের বিলুপ্তি।
১৬. ঢাকা সিটি	শিল্প দূষণ, নগর সম্প্রসারণ।	প্রথম শ্রেণীর কৃষি জমি ধ্বংস এবং দেশের অন্যতম কিছু *হর্টিকালচার* জমি নষ্ট হয়ে গেছে।
১৭. হাওর অববাহিকা	জলাশয় ভরাট।	মৎস্য চারণ ক্ষেত্র কমে যাওয়া।
১৮. দক্ষিণ সিলেট	বনোজাড়।	আকস্মিক বন্যা, ভূমিক্ষয়।
১৯. লালমাই রেঞ্জ	বনোজাড়।	ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস।
২০. নিম্ন-মেঘনা	নদী ভরাট, জনসংখ্যার চাপ।	বন্যার ক্ষয়ক্ষতি; ভূমিক্ষয়, কৃষি উৎপাদনে বন্ধ্যাত্ব, ক্ষয়িষ্ণু মৎস্যসম্পদ।
২১. কেন্দ্রীয় নোয়াখালী	জনসংখ্যার চাপ, লবণাক্ততা, নদী ভরাট।	পানি নিষ্কাশন প্রণালী ব্যাহত হয়, শুষ্ক মওসুমে সেচ কার্য ব্যাহত হয়, লবণাক্ত ভূগর্ভস্থ পানির কারণে হ্রাসমান কৃষি উৎপাদন, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা।
২২. স্বন্দীপ	দ্রুতমাত্রার ভূমিক্ষয়, নব্য গঠিত ভূমিরূপ।	অবস্থানিক কারণে প্রায়শই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস-আক্রান্ত।

অবক্ষিত এলাকা	অবক্ষয়ের ধরন	নেতিবাচক পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া
২৩. শীতাকুন্ডু রেঞ্জ	বনোজাড়, অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি।	ভূমিক্ষয়, উৎপাদন হ্রাস, ঘরের ছাউনির জন্য প্রয়োজনীয় খড়ের প্রধান উৎস বিধায় এলাকাটির ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা জরুরী হয়ে পড়েছে।
২৪. চট্টগ্রাম সিটি ও পোর্ট	শিল্প দূষণ, দূষিত তেল নির্গমন, পাহাড় কাটা।	ভূমিক্ষয়, নদী ভরাট।
২৫. চন্দ্রঘোনা	শিল্প স্থাপনা থেকে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক বর্জ্য নিষ্কাশন, নদী ভরাট।	স্বাস্থ্য বিপর্যয় হুমকি, মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের মুখে, দেশের বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুষ্কাল সীমিত হয়ে পড়েছে।
২৬. পার্বত্য এলাকা	ঝুম চাষ, পাহাড়ী ঢালের অনুপযুক্ত ব্যবহার, বহিরাগত অভিগমনকারী, বনোজাড়।	ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস, উপত্যকায় বন্যা, উৎপাদন হ্রাস।
২৭. চকোরিয়া সুন্দরবন	চিংড়ি চাষ, বনোজাড়, জোয়ারের স্তর হ্রাস।	বিপর্যস্ত পরিবেশ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস, বর্ধিত হারে বাড়ন্ত উষ্ণ অম্লযুক্ত মৃত্তিকা।
২৮. চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল, কুতুবদিয়া	তীরবর্তী ভূমিক্ষয়, উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও আকৃতি।	ক্ষয়িষ্ণু ভূমিরূপ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া; ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস।
২৯. কক্সবাজার	বিবেচনাহীন বৃক্ষনিধন, "ক্লিয়ার-ফেলিং" পদ্ধতির বন-ব্যবস্থাপনা।	দেশের বিশেষত্বময় সমৃদ্ধ জৈব-বৈচিত্র ধ্বংসের সম্মুখীন।
৩০. জিনজিরা দ্বীপ ও কোরাল প্রাচীর (সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ)	অতিমাত্রায় প্রবাল ও কম্বোজ আহরণ।	প্রবাল প্রাচীর ধ্বংসের মুখে।
৩১. সীমান্তবর্তী কিছু জেলা	ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক, প্রারম্ভিক মরুকরণ।	জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন, মরুকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

উৎস ঃ

(১) ইমাম, কাজী হাসান. ঃ পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৭, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৫।

(২) নিউজ মিডিয়া. ঃ সীমান্তের পাঁচ জেলায় ভূগর্ভের পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক, আজকের কাগজ, পৃ. ১; ২৯.১০.৯৫।

(৩) পরিবেশ অধিদপ্তর. ঃ *বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর;* ঢাকা, ১৯৯০।

(৪) মজুমদার, প্রণব. ঃ প্রসঙ্গ ঃ জমিতে লবণাক্ততার প্রভাব, দৈনিক খবর, ২৩.১০.১৯৯৫, ঢাকা।

(৫) Imam, Kazi Hasan : Naturkatastrophen und Armut der Menschen—Ansaetze praeventiver Umweltverwaltung in Bangladesch"*Entwicklungsrecht und sozial-oekologische Verwaltungspartnerschaft* Schrieftenreihe der Hochschule Speyer, Band 116, Duncker & Humblot, Berlin, 1994.

(৬) Nishat, Ainun : Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh, Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

(৭) Rahman, Atiq A. et al. : Environment and Development in Bangladesh vol. one & two, University Press Ltd., Dhaka, 1994.

মানচিত্র-১

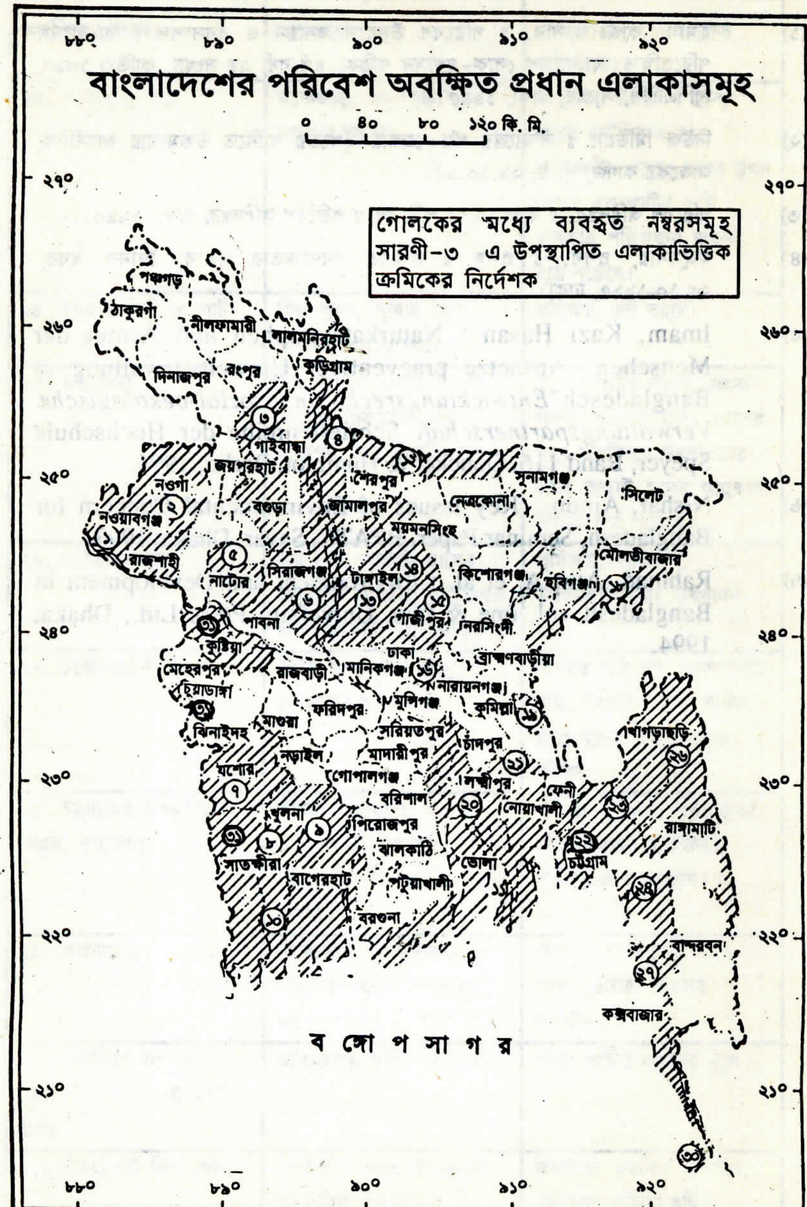
বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষিত প্রধান এলাকাসমূহ
০ ৪০ ৮০ ১২০ কি. মি.
গোলকের মধ্যে ব্যবহৃত নম্বরসমূহ সারণী-৩ এ উপস্থাপিত এলাকাভিত্তিক ক্রমিকের নির্দেশক
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁ
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
নওয়াবগঞ্জ
বগুড়া
শেরপুর
জামালপুর
সুনামগঞ্জ
সিলেট
নেত্রকোনা
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
টাঙ্গাইল
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
গাজীপুর
নরসিংদী
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
মেহেরপুর
রাজবাড়ী
মানিকগঞ্জ
নারায়নগঞ্জ
চুয়াডাঙ্গা
ফরিদপুর
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
ঝিনাইদহ
মাগুরা
সরিয়তপুর
চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
যশোর
নড়াইল
মাদারীপুর
গোপালগঞ্জ
লক্ষ্মীপুর
ফেনী
বরিশাল
নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
খুলনা
পিরোজপুর
চট্টগ্রাম
সাতক্ষীরা
ঝালকাঠি
ভোলা
বাগেরহাট
পটুয়াখালী
বরগুনা
বান্দরবন
কক্সবাজার
ব ঙ্গো প সা গ র
৮৮° ৮৯° ৯০° ৯১° ৯২°
২৭° ২৬° ২৫° ২৪° ২৩° ২২° ২১°

প্রয়োজনীয় জ্বালানীর অভাবে দেশের সীমিত বনাঞ্চলের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ছে। বৃক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চল হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার তীব্রতা *(FFYP, 1990, পৃ, V. E. 1)*। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পলালয়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। তুলনামূলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে; জনজীবন হয়ে উঠছে অতিষ্ঠ। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বনভূমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে; দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিছু জেলাতেও (যেমন যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি) মরুকরণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বনসম্পদ ধ্বংসের কারণে বন্য প্রাণির আবাসস্থল কমে যাচ্ছে; জৈব-বৈচিত্র হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন। এ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; ২৭টি প্রজাতি বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে আছে এবং ৩৯টি প্রজাতির জীবন হুমকির সম্মুখীন *(Nishat, 1993, পৃ. 8* বরেন্দ্রভূমি ও পাহাড়ী অঞ্চলের ভূমিক্ষয় (সারণী-৩) এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির তীব্রতা পরিবেশগত হুমকির সৃষ্টি করেছে *(মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ. ৭)*। সম্প্রতি দেশের পশ্চিম সীমান্তবর্তী বেশ ক' টি জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক পাওয়া গেছে, যা ঐ অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে *(নিউজ মিড়িয়া, ১৯৯৫, পৃ. ১)*।

বাংলাদেশের কোন শহরেই পরিমিত নগর সুবিধাদি নেই। অপরিকল্পিতভাবে শহর/নগর গড়ে উঠছে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে তার সম্প্রসারণ ঘটছে। যত্রতত্র গড়ে উঠছে শিল্প-কারখানা। স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোর প্রায় কোনটিরই বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো নদীতে ঢেলে দেয়া হয়। এ কারণে মৎস্য সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। একই এলাকায় বসতি ও শিল্প-কারখানার অবস্থান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলানো এবং অন্যান্য নানা কারণে নগর পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাজধানীসহ অন্যান্য শহরগুলোতে এলার্জির হার বাড়ছে। পানি বাহিত রোগের কারণে ভুগছে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শহরবাসী। পরিমিত নগর সুবিধাদির অভাবে বেশির ভাগ শহরবাসী মানবেতর জীবন যাপন করছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার অভাব। এ কারণে পরিবশ দূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয়ের গতি আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৪.০ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের অসুবিধাসমূহ

প্রকৃতির বিভিন্ন স্বাভাবিক পরিবর্তন থেকে মানুষের নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই পরিবেশ দূষিত হয় অনেক বেশি। তাই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াসের ব্যাপ্তিও অনেক।

৪.১ পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিকীকরণ

পরিবেশের কোন সীমা–পরিসীমা নেই। আর তাই প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশ দূষণকে কোন রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় সীমিত করা সম্ভব নয় *(Renner, 1987, পৃ. ৯৩)*। বিশ্বের এক স্থানে পরিবেশ দূষিত হলে এর কুফল সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। এক দেশের বা এক জাতির অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হয় প্রতিবেশী, এমনকি বিশ্ববাসী *(সিদ্দিকী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩)*। দূষণ প্রক্রিয়ার এই আন্তর্জাতিকীকরণ বৈশিষ্টের কারণেই চেরনোবিল দুর্ঘটনায় পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের এক বিরাট এলাকা জুড়ে তেজস্ক্রিয়–হুমকির সৃষ্টি হয় *(Zellentin, 1987, পৃ. ১৫)*; মেক্সিকোতে ব্যবহৃত কৃষি রাসায়নিক পদার্থ উত্তর কানাডায় মাছের লিভারে পাওয়া যাচ্ছে *(Aziz, 1994, পৃ. ৮)*; ইউরোপীয় শিল্প নির্গত বায়ুদূষণের মাধ্যমে সৃষ্ট অম্লবৃষ্টিতে *ব্লাক–ফরেষ্টের* ব্যাপক এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে; রাইন নদীর পানি দূষণ ইউরোপের সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে *(Renner, 1987 , পৃ. ১০০)*; ভারত কর্তৃক সৃষ্ট ফারাক্কা বাঁধ পরিবেশ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের জন্য "মরণ ফাঁদ" হিসেবে দেখা দিয়েছে *(Imam, 1994, পৃ. ২০৪)*; শিল্প উন্নত দেশগুলো কর্তৃক সৃষ্ট *গ্রীন–হাউস গ্যাস* সারা বিশ্বে পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে *(Huq, 1994, পৃ. ৭৮)*। আলোচ্য ঘটনাগুলো থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বৈশিষ্টগত কারণেই এককভাবে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের পক্ষে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হতে হবে সমন্বিতভাবে রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক।

৪.২ ভোগস্তরের বৈষম্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভোগস্তরের পার্থক্য বিস্তর। এ কারণে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। "বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত মানুষ (বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা) যেখানে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে ঘুমাতে যায়, সেখানে সম্পদশালীরা (বিশেষতঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো) লক্ষ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সমুদ্রে ফেলে দেয়, পুড়িয়ে দেয় তাদের অতিরিক্ত সম্পদ (যা আরো ব্যবহারযোগ্য বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য)— এ বৈষম্য আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়, না কি সহ্য করা উচিৎ" *(Newsweek, 1992, পৃ. ১২–১৩)*?

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ বসবাস করে। এরা বিশ্বের মোট জ্বালানীর ২৫ শতাংশ ব্যবহার করে *এমিশন* ছড়ায় বিশ্বের ২২ শতাংশ এবং *জিএনপি* উৎপাদন ও ভোগ করে ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতের জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ্বের ১৬ শতাংশ, জ্বালানীর ব্যবহার ৩ শতাংশ, এমিশন ছড়াচ্ছে ৩ শতাংশ এবং জিএনপি উৎপাদন ও ভোগ করে মাত্র এক শতাংশ *(Elmer-Dewitt, 1992, পৃ. ৩০–৩১)*। ধনী–দরিদ্র দেশের এরূপ অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও অঞ্চল ভেদে ধনী–ধনী ও দরিদ্র–দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্যও বিস্তর। *ইইসিভুক্ত* দেশ হলেও জার্মানী ও ইতালীর অর্থনৈতিক অবস্থা এক নয়; *সার্কভুক্ত* দেশের মধ্যে

৪.১ পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিকীকরণ

পরিবেশের কোন সীমা–পরিসীমা নেই। আর তাই প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশ দূষণকে কোন রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় সীমিত করা সম্ভব নয় *(Renner, 1987, পৃ. ৯৩)*। বিশ্বের এক স্থানে পরিবেশ দূষিত হলে এর কুফল সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। এক দেশের বা এক জাতির অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হয় প্রতিবেশী, এমনকি বিশ্ববাসী *(সিদ্দিকী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩)*। দূষণ প্রক্রিয়ার এই আন্তর্জাতিকীকরণ বৈশিষ্টের কারণেই চেরনোবিল দুর্ঘটনায় পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের এক বিরাট এলাকা জুড়ে তেজস্ক্রিয়–হুমকির সৃষ্টি হয় *(Zellentin, 1987, পৃ. ১৫)*; মেক্সিকোতে ব্যবহৃত কৃষি রাসায়নিক পদার্থ উত্তর কানাডায় মাছের লিভারে পাওয়া যাচ্ছে *(Aziz, 1994, পৃ. ৮)*; ইউরোপীয় শিল্প নির্গত বায়ুদূষণের মাধ্যমে সৃষ্ট অম্লবৃষ্টিতে *ব্লাক–ফরেষ্টের* ব্যাপক এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে; রাইন নদীর পানি দূষণ ইউরোপের সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে *(Renner, 1987 , পৃ. ১০০)*; ভারত কর্তৃক সৃষ্ট ফারাক্কা বাঁধ পরিবেশ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের জন্য "মরণ ফাঁদ" হিসেবে দেখা দিয়েছে *(Imam, 1994, পৃ. ২০৪)*; শিল্প উন্নত দেশগুলো কর্তৃক সৃষ্ট *গ্রীন–হাউস গ্যাস* সারা বিশ্বে পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে *(Huq, 1994, পৃ. ৭৮)*। আলোচ্য ঘটনাগুলো থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বৈশিষ্টগত কারণেই এককভাবে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের পক্ষে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হতে হবে সমন্বিতভাবে রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক।

৪.২ ভোগস্তরের বৈষম্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভোগস্তরের পার্থক্য বিস্তর। এ কারণে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। "বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত মানুষ (বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা) যেখানে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে ঘুমাতে যায়, সেখানে সম্পদশালীরা (বিশেষতঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো) লক্ষ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সমুদ্রে ফেলে দেয়, পুড়িয়ে দেয় তাদের অতিরিক্ত সম্পদ (যা আরো ব্যবহারযোগ্য বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য)— এ বৈষম্য আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়, না কি সহ্য করা উচিৎ" *(Newsweek, 1992, পৃ. ১২–১৩)*?

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ বসবাস করে। এরা বিশ্বের মোট জ্বালানীর ২৫ শতাংশ ব্যবহার করে *এমিশন* ছড়ায় বিশ্বের ২২ শতাংশ এবং *জিএনপি* উৎপাদন ও ভোগ করে ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতের জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ্বের ১৬ শতাংশ, জ্বালানীর ব্যবহার ৩ শতাংশ, এমিশন ছড়াচ্ছে ৩ শতাংশ এবং জিএনপি উৎপাদন ও ভোগ করে মাত্র এক শতাংশ *(Elmer-Dewitt, 1992, পৃ. ৩০–৩১)*। ধনী–দরিদ্র দেশের এরূপ অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও অঞ্চল ভেদে ধনী–ধনী ও দরিদ্র–দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্যও বিস্তর। *ইইসিভুক্ত* দেশ হলেও জার্মানী ও ইতালীর অর্থনৈতিক অবস্থা এক নয়; *সার্কভুক্ত* দেশের মধ্যে

ভারত–বাংলাদেশ অথবা শ্রীলংকা–বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এক নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভোগস্তরের এই পার্থক্যের কারণে জাতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণে ভিন্নতা দেখা দেয়; পরিবেশগত বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি–নির্ধারণী সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

৪.৩ পরিবেশ–রাজনীতি ও পরিবেশ–ফ্যাশন

আশির দশকে পরিবেশগত হুমকি সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো বহুল আলোচিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে ধনী–দরিদ্রের সেই নিরন্তন সংঘাত *(Prins, 1990, পৃ. ৭১৩)*। ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক বা বৈশ্বিকভাবে এ সংঘাত বিস্তৃত। 'সুয়েজ–সমস্যা'র সাথে তেলের "মূল্য–নিষেধাজ্ঞা" কে কেন্দ্র করে সত্তরের দশকে সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আগ্রাসন দু' দিনেই বিশ্বে তেলের মূল্য ২০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ বিশুদ্ধ পানির জন্য নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যা হাতে গোণা মাত্র কয়েকটি দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পানির অভাব বা পানিজাত শক্তির কর্তৃত্ব নিয়ে উজান–ভাটির দেশের মধ্যে দেখা দেয় আঞ্চলিক তিক্ততা ও সংঘাত। নীল নদের পানি–ব্যবস্থা নিয়ে মিশর ও ইথিওপিয়া, কলোরাডো নদীর পানি বন্টন প্রশ্নে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র, গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার তিক্ততা সর্বজনবিদিত। এসব ক্ষেত্রে ভাটির দেশের কিছু করার না থাকলেও তারা নানাবিধ পরিবেশগত হুমকির সম্মুখীন হয়। নদীতে বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ ও তার সুবিধা–বন্টন প্রশ্নে সুহৃদ প্রতিবেশীসুলভ ঐক্যে ফাটল ধরে। ষাট ও সত্তরের দশকে ক্যারিবিয়ান বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জাম্বিয়া ও জিম্বাবুই এবং মোজাম্বিক ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে *কাবোরা বাছা* বাঁধের বিদ্যুৎ বন্টন নিয়ে একই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার তিক্ততা এখন চরম পর্যায়ে। এসব কার্যক্রম ভাটির দেশগুলোতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয় ছাড়াও সীমান্তপারের দূষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে *(Prins, 1990, পৃ. ৭১৫)*।

পরিবেশ রাজনীতির আর একটি বড় ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি হচ্ছে গৃহীত নীতিমালা ও কার্যক্রমের বৈপরিত্য। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ধরিত্রী সম্মেলনে জৈব–বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রশ্নে সারা বিশ্ব এজেন্ডা–২১ নিয়ে সম্মত হলেও উন্নত বিশ্বের দস্যুবৃত্তি ও আগ্রাসনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব থেকে বনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পাচার চলছে ব্যাপকভাবে *(সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৪–১৬)*। সম্পদ পাচারের এই সম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের করাল গ্রাসে নিপতিত তৃতীয় বিশ্বকেই আবার এর কারণে উদ্ভুত পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করা হয়। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, *আইএমএফ* প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে উন্নত বিশ্বের কতগুলো দেশ দ্বারা। এ দেশগুলো উন্নয়ন সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বকে যে সকল শর্তের আবর্তে ফেলে দিচ্ছে, তাতে পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে পরিবেশ অবক্ষয়কেই ত্বরান্বিত করছে বেশি।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই দাতা সংস্থার আর্থিক সাহায্য নির্ভর। বৈশ্বিক পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে দাতাসংস্থাগুলো অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ সম্মত কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে, সাহায্য গ্রহীতা দেশগুলোও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সে' মত কিছু কাগুজে কর্মসূচি গ্রহণ করে ও তার প্রচারণা চালায়। এতে দাতা সংস্থা খুশী থাকলেও গৃহীত কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয় না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরূপ সৌন্দর্যবর্ধক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস ও রাজনীতিবিদদের পরিবেশ-ফ্যাশন বস্তুত পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে পরিবেশ অবক্ষয়কেই ত্বরান্বিত করে।

অন্যদিকে, কোন সরকার কর্তৃক ব্যাপক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গৃহীত হলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুবিধাভোগী দলের চাপের কারণে অনেক সময় তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না *(The World Bank, 1992, পৃ. ২৩)*। বস্তি-উচ্ছেদ তৃতীয় বিশ্বের নগর পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীন সরকার কখনোই এ কার্যক্রমটি গ্রহণ করে না। কেননা, রাজনৈতিক দলগুলো এখান থেকেই বিপুল পরিমাণ 'ছাক্কা ভোট' আশা করে। একই কারণে কীটনাশকের ভর্তুকী তুলে নেয়া যায় না, দূষণকারীদের ওপর পর্যাপ্ত করারোপ করা সম্ভবপর হয় না।

৪.৪ দুর্বল সরকার/প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিমিত মাত্রায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সরকার কাঠামো ও সুব্যবস্থিত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ *ম্যাকানিজম,* অর্থাৎ পর্যাপ্ত আইন, আইনের সুনির্দিষ্টতা, দক্ষ জনবল ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে-এ সবের-ই অভাব রয়েছে। এছাড়া দুর্বল তথ্য-ভিত্তি *(Poor Information Base)*, দুর্বল তথ্য প্রবাহ, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *(Rahman,1994, পৃ. ২-৩)*। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অনেক সংস্থা থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ওপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের জাতীয় নীতিমালায় এ সকল সংস্থার সুপারিশমালার যথার্থ প্রতিফলন ঘটায় না *(Zellentin,1987, পৃ. ১১)*। *আইএমএফ,* বিশ্বব্যাংকসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত নীতিমালা অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ও অগ্রহণযোগ্য। বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের উন্নয়ন ও পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন। এ ধরনের নীতিমালা-ই পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কেননা, উন্নয়ন সিদ্ধান্তে পরিবেশ বা সমাজের ক্ষতি-মূল্যকে প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হয় *(Aziz, 1994, পৃ. ৯-১০)*।

৪.৫ জনসংখ্যার আধিক্য ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা

বিগত এক শতাব্দির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে মালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে, পরিবেশ অবক্ষিত হচ্ছে দ্রুত লয়ে এবং খুব দ্রুত পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বন্য প্রাণিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ *(Newsweek,1992, পৃ. ২২-২৩)*। জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ ও সম্পদের

সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট অসুবিধা সম্পর্কে ইতপূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। সম্পদ ও জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির এই বৈপরিত্যময় প্রকিয়ায় উদ্ভুত অর্থনীতিকে তাই বিশেষজ্ঞরা "বিষন্ন বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করেছেন *(The World Bank, 1992, পৃ. ৩৭)*। আলোচিত এ দু' টি সম্পদের এই বৈপরিত্যময় সম্পর্কের কারণে একদিকে যেমন বাড়ছে বিশ্ব-দারিদ্র, পরিবেশ অবক্ষয়ের গতি হচ্ছে ত্বরান্বিত এবং অন্যদিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যথার্থ পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে।

৪.৬ অশিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার অভাব

সাম্প্রতিককালে বিশ্ব জুড়ে আপেক্ষিক পরিবেশ সচেতনতা বাড়লেও বিশেষতঃ বাংলাদেসসহ তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্টীর শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার অভাব পরিবেশ অবক্ষয়ের একটি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপক শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার অভাবের কারণে নিজের অজান্তেই তারা পরিবেশ অবক্ষয়ের মাধ্যমে আত্মহননের পথকে সুগম করছে; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ অবক্ষয়ের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতিসাধন করছে; ব্যাপক পরিবেশ সচেতনতার পক্ষে জনমত গড়ে উঠছে না এবং সরকারীভাবে গৃহীত কর্মসূচি আশানুরূপ সফল হচ্ছে না।

৫.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কলা-কৌশল

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মানুষকে বস্তুগত প্রাপ্তি ও নানাবিধ ভোগ-বিলাসের স্বাদ দিয়েছে। আর তাই, বস্তুগত সম্পদ পাবার আশা সাধারণত তার কখনোই হ্রাস পায় না। সম্পদের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং সেটা একারণে নয় যে, আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি; বরং আমাদের খুব স্বল্প সংখ্যকই অনেক কিছু দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে থাকে এবং যার অনেক কিছুই আমাদের জীবন যাপনের, এমনকি বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সমগ্র সমাজেরই জীবমন্ডলের *(Bio-sphere)* ওপর আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার তাই, সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত কলা-কৌশলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৫.১ কেন্দ্রীয় পরিবেশ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব

রাষ্ট্র পরিচালনার্থে সরকার কিছু কিছু দায়িত্ব নিজের হাতে রাখে, কিছু দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে অর্পণ *(ডেলিগেট)* করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের এমন কিছু কার্যক্রম থাকে, (যেমন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি) যার দায়িত্ব অন্যের কাছে অর্পণ করা সম্ভব নয়, করলে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ধ্বস নেমে আসে— পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ রাষ্ট্রের তেমনই একটি কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ কার্যক্রমের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

৫.২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে পর্যাপ্ত আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগযোগ্য সুনির্দিষ্টতা নির্ধারণ ও বাস্তব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; গণসংযোগ ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রশাসনিক স্তরসমূহকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতির সমন্বয় সাধন করতে হবে। কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সুষ্ঠুভাবে তার 'পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ' *(Environmental Impact Assessment)* করে সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৩ করারোপ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর-প্রথা চালু থাকলেও এখন পর্যন্ত পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর-সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। দূষণকারীরা সাধারণতঃ প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবক্ষয় ঘটিয়ে ব্যক্তিক বা গোষ্ঠীগত মুনাফা অর্জনে অভ্যস্ত। এর জন্য যে খেসারত হিসেবে কর দিতে হবে, এমন ধারণা অনেকের মধ্যে নেই বললে চলে *(Eskeland, 1991, পৃ. ১৫)*। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। প্রয়োজনীয় কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রিত হবে, অন্যদিকে এ থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং এ অর্থ দিয়ে অধিকতর উন্নত পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রমিত মাত্রার দূষণের জন্য নির্ধারিত করের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিশোধন ব্যবস্থার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা যেতে পারে।

৫.৪ পরিবেশ উন্নয়নে উৎসাহদান

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোন কার্যক্রমেরই ব্যাপক সফলতা আশা করা যায় না। এজন্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সরকারকে পরিবেশ বন্ধুসুলভ কাজে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াতেও উৎসাহ প্রদানের বিষয়টির সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। প্রমিত মাত্রায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার দূষণকারীদের জন্য '*ট্যাক্স-রিবেট*' বা '*ট্যাক্স-হলিডে*' প্রথার প্রবর্তন করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রথার প্রবর্তনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকরী হয়। কেননা, দূষণকারীদের কাছে এ প্রথা প্রবর্তনের ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণই ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে অপেক্ষাকৃত সস্তা হিসেবে প্রতিভাত হয় *(Eskeland, 1991, পৃ. ১৬)*।

৫.৫ পরিবেশ সংরক্ষণে বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি

প্রজন্মান্তর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ও টেকসই উন্নয়নে 'পরিবেশ–বিবেচনা'র বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রচলিত আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া *(control mechanism)* যথার্থ কার্যকরী হয়না অথবা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া থেকে অন্য কোন প্রক্রিয়া অধিকতর কার্যকরী হ'তে পারে। এ জন্য বিশেষজ্ঞগণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু 'বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি'র *(alternative delivery system)* আলোকপাত করেছেন। নিম্নে এমন কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো ঃ

৫.৫.১ পরিবেশগতভাবে সমন্বিত হিসেব রক্ষণ পদ্ধতি (EAAS)

Environmentally Adjusted Accounting System (EAAS) একটি পদ্ধতিগত ধারণা। এ ধারণায় উৎপাদনের সকল স্তরে—হোক সে পণ্য বা সেবা উৎপাদন—লাভ-ক্ষতির সব জাতীয় হিসাব–নিকাশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এ হিসেব একটি মুদ্রামানে নিয়ে আসতে *(convert* করতে) হবে *(Lutz, 1991, পৃ. ১৯–২০)*। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে আরো পরিষ্কার করা যাক।

ধরি, একটি কৃষিভূমি থেকে বীজ, সার, শ্রম ইত্যাদি মিলে ১০০ টাকা বিনিয়োগ করার পর ১৫০ টাকার উৎপাদন পাওয়া গেল। তা' হলে সাধারণ নিয়মে এক্ষেত্রে লাভ ৫০ টাকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমি কর্ষণ, কীটনাশক, সারের ব্যবহার ইত্যাদি নানাবিধ কারণে উক্ত কৃষিভূমি পরিবেশগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এ ক্ষতির পরিমাণটিও হিসেবের বিবেচনায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ যদি ২০ টাকা হয়, তা' হলে প্রকৃত লাভ হবে ৩০ টাকা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে হিসাব রক্ষণের সুবিধা হলো, পরিবেশগতভাবে আমরা কিভাবে এবং কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তা' জানা যায় এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায়ও বের হয়ে আসে। তাছাড়া মানুষ অধিকতর পরিবেশ সচেতন হয় *(Lutz, 1991, পৃ. ১৯–২০)*। তবে, এ জাতীয় পদ্ধতি সূচনা করার মূল সমস্যা হলো, সকল পরিবেশগত ক্ষতি মুদ্রামানে পরিমাপ করা খুবই দুঃসাধ্য।

৫.৫.২ প্রতিষেধক বনাম প্রতিকার(Preventive Vs Curative Measures)

বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ তার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষিত করছে এবং বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়েও দূষিত পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে, একটি নির্দিষ্ট ও প্রমিত মাত্রায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। আর এ জন্য যে ব্যয় হয়, তা থেকে দূষণ করার পূর্বে যদি প্রতিষেধক পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে ব্যয়ের সিংহভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব *(Renner, 1987, পৃ. ৯৩)*। সুতরাং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিকার থেকে প্রতিষেধক·পদক্ষেপ নেয়াই শ্রেয়তর।

৫.৫.৩ পরিবেশগত সম্পদাধিকার অর্পণ (Environmental Property Right)

'পরিবেশগত সম্পদাধিকার অর্পণও একটি পদ্ধতিগত ধারণা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। অন্যের অনিষ্ট না করে সে এটা ভোগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কিন্তু কেও যদি পরিবেশ দূষণ ঘটায়, তা' হলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য এবং এ ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ কি হবে তা ক্ষতিগ্রস্তরা নির্ধারণ করবে *(Eskeland, 1991, পৃ. ১৭)*।

তবে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এজাতীয় ধারণার সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি পূর্বশর্ত নিশ্চিত করতে হবেঃ

(১) যে জনগোষ্ঠীকে এ অধিকার অর্পণ করা হবে, সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে সেখানকার মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

(২) ঐ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত অর্থাৎ যথেষ্ট পরিবেশ সচেতন হতে হবে, এবং

(৩) সর্বোপরি ঐ দেশে একটি বিকেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেখানে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা থাকতে হবে।

পরিবেশগত সম্পদাধিকার অর্পণের এই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত ক্ষতির দিকসমূহ নির্ণীত হবে, মানুষের সচেতনতা বাড়বে এবং পরোক্ষভাবে তা দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রভাব রাখবে।

৬.০ উপসংহার

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ, দেশ ও জাতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে বিশেষজ্ঞ মহলে উত্তপ্ত বিতর্ক রয়েছে একথা সত্য। তবে, যে কোন মূল্যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ক্যান্সার কোষের ধর্ম। কিন্তু প্রবৃদ্ধিই উন্নয়নের একমাত্র নির্ণায়ক নয়। আর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন হলো প্রক্রিয়াগত দিক থেকে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' প্রচলনের মত, যার সুফল দীর্ঘ-মেয়াদে দৃশ্যমান হয়। আর তাই, পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যিক এবং এর মাধ্যমেই আসবে প্রকৃত উন্নয়ন।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Adnan, Shapan. : Floods, People and the Environment : Reflection on Recent Flood Protection Measures in Bangladesh; *Environment and Development in Bangladesh;* vol. one, University Press Ltd., Dhaka, 1994.

২. Aminullah. : *Environment and Development;* Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar, 1992.

৩. Aziz, Khalid. : Environmental Issues and Problems in Pakistan, *Pakistan Administration;* A Journal of Pakistan Administrative Staff College, vol. xxix-xxxi, July-Dec. 1992—January-June 1994, No. 2, 1 & 2, 1; Lahore, 1994.

৪. Barner, J. : *Experimentalle Landschaftsoekologie: Lehrbuch der Umweltforschung;* Ferdinand Enke Ferlag, Stuttgart, 1983.

৫. Elmer-Dewitt, Philip. : Rich Vs Poor: Summit to Save the Earth; *Time,* the Weekly Newsmagazine, vol. 139, No. 22, June 1, 1992.

৬. Eskeland, Gunnar S. and Jimenez, Emmanuel. : Curbing Pollution in Developing Countries; *Finance & Development;* a quarterly publication of the International Monetary Fund and The World Bank, Specially on Environmental Choices and Development Issues, March 1991.

৭. Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fourth Five Year Plan 1990-95,* Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990.

৮. Hossain, M. A. et al. : Arsenic Pollution in and Around Urea Fertilizer Factory Limited, Ghorasal; *The Dhaka University Studies,* Part B (Science), vol. 41, No. 2, July 1993, P. 139-144.

৯. Huq, Saleemul and Rahman, A Atiq. : Environment and Development Linkages: An International Perspective; *Environment and Development in Bangladesh;* Vol. one, University Press Ltd., Dhaka, 1994.

১০. Imam, Kazi Hazan.: Naturkatastrophen und Armut der Menschen-- Ansaetze praeventiver Umweltverwaltung in Bangladesch; *Entwicklungsrecht und sozial-oekologische Verwaltungspartnerschafrt;* Schrieftreihe der Hochschule Speyer, Band 116, Duncker & Humblot, Berlin, 1994.

১১. Islam, M. Aminul and Sadeque S. Zahir. : Rural Land Use Planning in Bangladesh: Environmental Consideration; *Environment and Natural Resource Management in Bangladesh* ed. by S. Zahir Sadeque, BSA, Dhaka, 1992.

১২. Lutz, Ernst and Munasinghe, Mohan. : Accounting for the Environment, *Finance & Development;* a quarterly publication of the Interntional Monetary Fund and The World Bank; specially on Environmental Choices and Development Issues; March, 1991.

১৩. Newsweek. : Earth at the Summit, special Report, vol. Cxix, No. 22, June 1, 1991.

১৪. Nishat, Ainun. : Key issues of Environmental Concern for Bangladesh; Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

১৫. Prins, Gwyn. : Politics and the Environment; *International Review*, vol. 66, No. 4, the Royal Institute of International Affairs, Cambridge Univesity Press, 1990.

১৬. Rahman, A Atiq and Huq, Saleemul. : Environment and Development Linkages in Bangladesh; : *Environment and Development in Banglades;* vol. one, University Press Limited, Dhaka, 1994.

১৭. Rana, Madhukar S. L B. : Disaster Management; Prashasan, *The Nepalies Journal of Public Administration,* year 21, No. 2, 5th Issue, 1990.

১৮. Renner, Guenter. : Unweltschutz in Europa am Beispiel Rhein, am Beispiel Katalysator; Unterrichtsmatcerial fuer die Sekundarstufe II; : *Europaesche Themen im Unterricht;* Bundeszentrale fuer politische Bildung, Band 254, 1987.

১৯. The World Bank.: *World Development Report 1992:* Development and the Environment, Oxford University Press, New York, 1992.

২০. Zellentin, Gerda. : Oekologie and Oekonomie in europaeischer Dimension: Moeglichkeiten and Grenzen einer Umweltpolittik der Europaeischen Gemeinschaft; *Europaeische Themen im Unterricht;* Bundeszentrale fuer politische Bildung, Band 254, 1987.

২১. ইমাম, কাজী হাসান. : পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ; বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত; *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৭, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৫।

২২. পরিবেশ অধিদপ্তর. : *বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর; ঢাকা, ১৯৯০।*

২৩. নিউজ মিডিয়া. : সীমান্তের পাঁচ জেলায় ভূগর্ভের পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক; আজকের কাগজ, ঢাকা, পৃ. ১; ২৯.১০.১৯৯৫।

২৪. মজুমদার, প্রণব. : প্রসঙ্গঃ জমিতে লবণাক্ততার প্রভাব; দৈনিক খবর । ঢাকা, ২৩.১০.৯৫।

২৫. সিদ্দিকী, গিয়াস. : যে লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা নেই তবুও লড়ে যেতে হবে; *পরিবেশ ও আমরা,* পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩।

২৬. সিদ্দিকী, গিয়াস. : *সবুজ স্বর্ণঃ বনদস্যুদের তৎপরতা;* পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিমাণগত পদ্ধতির ভূমিকা পর্যালোচনা

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান*

১.০ ভূমিকা

১.১ সিদ্ধান্তগ্রহণ একজন ব্যবস্থাপক অথবা প্রশাসকের প্রধান দায়িত্ব। তবে সঠিকভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রতিটি ধাপ বা পর্যায়ে পরিমাণগত পদ্ধতির বিষয়বস্তু নিবিড়ভাবে জড়িত। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাধারণ দিকগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে অনুরণিত হয়; যা আচরণ বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্বের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। একজন কৃষক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জমিতে কৃষিকাজের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে থাকেন। কৃষকের গতানুগতিক কার্যব্যবস্থায় নতুনত্ব তেমন থাকে না। তবে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের তেমন প্রভাব থাকে না, সেখানে উপাত্ত বিশ্লেষণ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। একজন প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক গতানুগতিক কাজগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বা প্রচলিত নিয়ম কানুনের অবয়বে দেখাতে পারেন। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম কানুনের প্রয়োগের বাইরে সমস্যা সমাধানে সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে অনেক সময়ই পরিমাণগত পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১.২ কিন্তু পরিমাণগত পদ্ধতি বিষয়টি খুব সহজেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ছাঁচে ফেলা যায় না। এ জন্য কঠোর মনোনিবেশ ও অনুশীলনের প্রয়োজন, যা একজন ব্যবস্থাপক অনেক সময়েই এড়িয়ে যেতে চান। পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে এ সমস্যাটি পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

২. প্রয়োগিক দিক

২.১ পরিমাণগত পদ্ধতির প্রায়োগিক দিকের প্রয়োজনীয়তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়ঃ

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

উদ্ধৃতি–ক

"Some data are derived from empirical studies prepared by individual scholars working with very limited budgets. Their *purposive or random* samples were taken at different places at different times, using different methods. Their statistics are valid, but comparisons are risky. Similarly, statistics taken from different *censuses* and *time series* are not always comparable because of change of *definition, coverage* and estimating procedure".

Source : Bangladesh Agricultural Sector Review, UNDP, February 1989, P III.

২.২ এ উদ্ধৃতির মধ্যে বাঁকা অক্ষরে লেখা প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপাত্তের ব্যবহার কেন্দ্র-বিন্দুতে থাকে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণার প্রকৃতি বা প্রত্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অথবা নীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখে। সে জন্য গবেষণা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই উদ্ধৃতির মধ্যে বেশ কয়েকটি শব্দ রয়েছে, যা একজন প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। পরিমাণগত পদ্ধতির প্রাথমিক সোপানে এই বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় যা একজন প্রশাসকের উপাও সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রকৃতি বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্ধৃতি–খ

"It was by comparing the whole spectrum of word-length preferences that Mendenhall hoped to offer a scientific solution to disputes about authorship. His most ambitious attempt in this direction was a study of the Shakespeare Bacon controversy in the Popular Science Monthly in 1901. With a grant from a Boston philanthropist, Mendenhall employed two secretaries and a counting machine to analyse some 400,000 words of Shakespeare, 200,000 words of Bacon and quantities of text from authors of other periods. He found that Shakespeare's characteristic curve was very consistent from sample to sample, whether poetry or prose; it had unusual features. Shakespeare's vocabulary consisted of words whose average length was a trifle below four letters, less than that of any writer of English before studied; and his word of greatest frequency was the four letter word, a thing never met with before. These characteristics marked Shakespeare out from

most of his contemporaries just as sharply as from the 19th century authors previously,

Source : Anthony kenny. *The computation of Style : An introduction to statistics for students of Literature & Humanities*, Pargamon press, P.2.

২.৩ এই উদ্ধৃতি "Shakespeare-Bacon Controversy" শিরোনামে মাসিক "Popular Science" পত্রিকায় ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি নামবিহীন লেখা সেসময় সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল। নামবিহীন লেখাটিকে অনেকে সেকসপিয়ারের লেখা বলে সনাক্ত করেন, কেও কেও বেকনের লেখা বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এ কৌতূহল নিরসনের কোন প্রক্রিয়া তখন জানা ছিল না। অবশেষে বোষ্টনের এক জনদরদী ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে মেনডেনহেলের প্রচেষ্টায় লেখাটির সঠিক লেখককে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, শুধু শব্দের গঠন বা আকার থেকে যে "Characteristic Curve" পাওয়া গিয়েছিল, তাই সঠিক লেখককে সনাক্তকরণে যথেষ্ঠ ছিল।

উদ্ধৃতি–গ

Annual Average Consumer Price Indices of Government Emplyees (middle income group) in Dhaka

(Base : 1969-70=100)

Year	General Index	Food	Fuel and lighting	Housing & household requisites	Clothing & footwear	Miscellan eous
1981-82	709	697	818	933	725	578
1982-83	758	725	883	1041	793	635
1983-84	833	824	894	1057	837	713
1984-85	931	934	1057	1114	926	796
1985-86	1014	1024	1210	1269	968	818
1986-87	1130	1170	1264	1416	1034	877
1987-88	1241	1256	1330	1690	1133	977
1988-89	1370	1363	1508	1883	1269	1110
1989-90	1498	1461	1806	2055	1337	1263
1990-91	1592	1558	1909	2213	1394	1330
1991092	1671	1642	1955	2275	1468	1416
1992-93	1746	1692	2001	2434	1537	1515

Source : Price Section, B. B. S.

২.৪ উদ্ধৃতি 'গ' তে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত জীবন ধারণের ব্যয়সূচক সংখ্যার ওপর একটি সারণী সংযোজন করা হয়েছে। জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহের সূচক (Cost of Living Index) প্রায়শই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সূচক সংখ্যা একটি বৎসরের তুলনায় অন্য একটি বৎসরের জীবন ধারণের খরচের বৃদ্ধি বা হ্রাস শতকরা হারে প্রকাশ করে। মহার্ঘভাতার হার নির্ধারণে বা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ নিরূপণে জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহের সূচক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ উদ্ধৃতি দৈনন্দিন জীবনযাপনে সংখ্যার ওপর গুরুত্ব বহন করছে। বৎসর ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাদ্য, জ্বালানী, বাসস্থান ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সাথে মোট খরচ বৃদ্ধির দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

৩.০ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও পরিমাণগত পদ্ধতি ঃ আপেক্ষিক সম্পর্ক ঃ

৩.১ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে। জন ডেওয়ি তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সমস্যা সনাক্ত করণ, দ্বিতীয়টি সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প পন্থার সন্নিবেশন, তৃতীয়টি সন্নিবেশিত বিকল্প থেকে উৎকৃষ্টতর বিকল্পটি বেছে নেয়া। হারবার্ট সাইমণ এই পর্যায়সমূহকে যথাক্রমে বুদ্ধিমত্তা (Intelligence), নকসা (Design) এবং মনোনয়ন (Choice) বলেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধাপ বা পর্যায়গুলো আলোচনা করা হল।

(ক) সমস্যা সনাক্ত করণ ঃ

একজন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে সমস্যা সনাক্তকরণ অন্যতম। সমস্যা সনাক্তকরণের নির্ভুলতার ওপর অন্যান্য পদক্ষেপের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। সাধারণত ঈপ্সিত ও বাস্তব অবস্থার ব্যবধানের কারণে সমস্যার উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, আয়ের প্রবৃদ্ধি ও বন্টনের বৈষম্যকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ের বন্টনের সমতা ঈপ্সিত, কিন্তু উন্নয়ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে বাস্তবতার নিরিখে অনেক সময়ই ভিন্ন অবয়ব ধরা পড়ে।

(খ) বিকল্প পন্থাসমূহের উদ্ভাবন ঃ

সমস্যা সনাক্তকরণের পরবর্তী পর্যায় বিকল্প পন্থাসমূহের উদ্ভাবন। আয়ের বন্টনে সমতার লক্ষ্যে পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করতে হবে। একটি সম্ভাব্য বিকল্প হল শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি অথবা সম্পদের বন্টনের মাধ্যমে পূর্ব থেকে সমতা আনা। সময়, সম্পদ এবং লব্ধ তথ্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিকল্প পন্থাসমূহ বিবেচনা করতে হয়।

(গ) বিকল্প পন্থাসমূহের মূল্যায়ন ঃ

উদ্ভাবিত পন্থাসমূহের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ মূল্যায়নের জন্য পূর্বনির্ধারিত কতগুলো ছক/কাঠামো থাকতে পারে এবং সংখ্যার মাধ্যমে পন্থাসমূহের তুলনামূলক উৎকর্ষ যাচাই করা যেতে পারে।

(ঘ) বিকল্প সনাক্তকরণ ঃ

মূল্যায়িত বিকল্প সমূহের মধ্য থেকে একটি বিকল্প নির্বাচন করতে হবে, যা সমস্যা সমাধানে ও লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখবে। অন্যথায় সময়, সম্পদ, পরিবেশ বাস্তবায়নের সমস্যা বিবেচনা করে সবচেয়ে লাগসই ও বাস্তবায়নযোগ্য বিকল্প বাছাই করতে হবে।

৩.৩ ব্যবহারিক জীবনে বিকল্প পন্থাসমূহ উদ্ভাবন, মূল্যায়ন ও সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। সমস্যার প্রকৃতি ও জটিলতার স্তর ভেদে যথাযথ বিকল্পটি বেছে নেয়া কঠিন মনে হতে পারে। মূলত পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের উদ্যোগে কিছু নতুনত্ব (Novelty) থাকে, সে জন্য এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারে যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও দক্ষতার প্রয়োজন।

৩.৪ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপ ও পরিমাণগত পদ্ধতির সাথে সম্পর্ক একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

চিত্র ১ – পরিমাণগত পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপের সম্পর্ক।

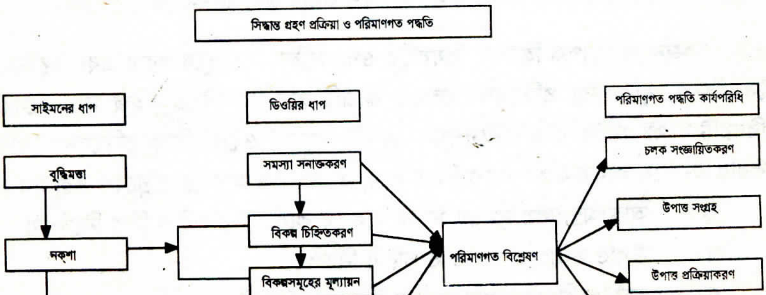

চিত্র ১– পরিমাণগত পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপের সম্পর্ক।

৩.৫ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপই পরিমাণগত পদ্ধতির উল্লিখিত চারটি কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির কার্যাবলীর মধ্যে, উল্লেখযোগ্য হল চলক সংজ্ঞায়িতকরণ, উপাও সংগ্রহ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ধাপেই এ চারটি কার্যাবলীর প্রয়োজন হয়। তবে অনেক সময় এ চারটি কার্যক্রমের কোন কোনটি বিবেচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। যেমন, মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাও সংগ্রহে অনেক সময় উদ্যোক্তার উপাও সংগ্রহের বিস্তারিত পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। উপাও বিশ্লেষণ যেখানে তুলনামূলক সহজ; যেমন গড় বয়স নির্ধারণ, সেখানে প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের পরিমাণগত পদ্ধতির ওপর প্রজ্ঞা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আছে বলে ধরা যায়। তবে চাহিদার (Demand) ওপর বিভিন্ন নিয়ামকের (Determinant) প্রভাব নিরূপণে নির্ভরণের (Regression) ব্যবহার ও ব্যখ্যায় পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।

৪.০ একটি উদাহরণ

৪.১ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক জীবনের একটি সমস্যা চিহ্নিত করে বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে। মনে করুন, আপনি একজন সহকারী সচিব হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। জাতিসংঘের ইউনেস্কো সদর দপ্তর থেকে নির্বাহী কর্মকর্তা আপনার সচিব মহোদয়কে প্রাইমারী স্কুলে অধ্যায়নরত পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যাজ্ঞানের ওপরে বস্তুনির্ভর একটি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করেছেন। এই প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে ইউনেস্কো বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যাজ্ঞানের ওপর একটি পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবে। সচিব মহোদয় নির্বাহী কর্মকর্তার পত্রটি কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে দিয়েছেন।

৪.২ একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে বিষয়টির ওপর সঠিক চিত্র তুলে ধরার এবং বস্তুনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক, যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিবেদন লেখার কাজটি আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও বিষয়টি যথেষ্ট জটিল ও অভিনিবেশঘন। একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য যে কার্যক্রম আপনাকে নিতে হবে, তা সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশ করা হল ঃ

ক। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভার মাধ্যমে কার্যক্রমের সঠিক দিক নির্দেশনা

খ। উপাও সংগ্রহের পদ্ধতি ও পরিধি নিরূপণ

গ। ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যা জ্ঞানের বর্তমান পর্যায় নিরূপণের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পূর্ব-পরীক্ষণ (Pre-testing)

ঘ। উপাও প্রক্রিয়াকরণ

ঙ। উপাও বিশ্লেষণ

৪.৩ এ কার্যক্রমের বাস্তবায়নে পরিমাণগত পদ্ধতির প্রয়োগিক দিক তুলে ধরা সম্ভব। প্রথমত আন্তমন্ত্রণালয়ের সভার কার্যপত্রে বিভিন্ন চলক সংজ্ঞায়িতকরণ ও উপাও সংগ্রহের বিস্তারিত আলোচনা থাকা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে উপাও সংগ্রহের পদ্ধতি (নমুনা বা জরিপ), প্রশ্নপত্র (Questionnaire) প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে কোন কার্যক্রমের সাথে ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত। সেজন্য কর্মপন্থা উদ্ভাবন ও নির্বাচন অবশ্যই ব্যয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যথেষ্ট সতর্কতা থাকা প্রয়োজন। কারণ সংখ্যাতত্ত্বের ওপর শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়ন একটি সঠিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ওপর নির্ভর করে।

৫.০ উপসংহার

৫.১ উপাও প্রক্রিয়াকরণ ও উপাও বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য নয়। প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক হিসেবে এ বিষয়ে পারদর্শিতা অপরিহার্য নয়, তবে কোন প্রতিবেদনে এ বিষয়ের ওপর আলোচনা থাকলে একজন প্রশাসক অথবা ব্যবস্থাপকের বিষয়গুলো বিশ্লেষণের জন্য প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কম্পিউটার প্রযুক্তির কারণে অনেকেই উপাত্ত বিশ্লেষণে ও উপাও প্রক্রিয়াকরণে সফট্ওয়ার ব্যবহার করতে পারেন, তবে কম্পিউটার প্রদত্ত বিভিন্ন উপাত্ত যথাযথ বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীর পরিমাণগত পদ্ধতির জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে একজন প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অধুনা তথ্যের প্রযুক্তিগত বিপ্লব আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে যেমন সহজ করেছে তেমনি এক অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক ও সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বি ঃ দ্র ঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের উন্নয়ন অর্থনীতি মডিউলের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Anthony kenny, 1982 *The Computation of Style, An Introduction to Statistics for students of Literature and Humanities*, Pergamon press, New York,

2. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৪, *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান* বর্ষগ্রন্থ শ্রাবন ১৪০২।

3. Cheristopher K. Mckenne, 1980 *Quantitative Methods for Public Decision Making*, McGraw-Hill Book Company, New York,

4. UNDP, 1989. *Bangladesh Agricultural Sector Review*, February,

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

জোবায়ের এনামুল করিম*

১.০ ভূমিকা

১.১ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এসব দেশে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচেষ্টায় বা বিনিয়োগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে উঠে সরকারি খাতের ব্যাপক বিস্তৃতি একটি স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির এ প্রয়োজন মেটাতে বা উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রসারের তাগিদে বা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রচুর সম্পদ। সমাজে প্রাপ্য সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) আর্থিক সম্পদ ও (৩) মানব সম্পদ। সম্পদ আহরণ বলতে সম্পদ সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহারকে বোঝায় । উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য দু' ধরনের উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়; (ক) অভ্যন্তরীণ ও (খ) বৈদেশিক। বর্তমান নিবন্ধে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব, এর উৎস, বাংলাদেশের কর কাঠামো, বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব

২.১ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কেননা, বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু' ধরনের মূল্য দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরতা স্বনির্ভতরতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয় টেনে আনতে পারে, জাতীয়তাবাদী স্পৃহা বা সত্ত্বার বিকাশ বিলম্বিত করতে পারে; কখনো দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা ঔপনিবেশিক বা আধা ঔপনিবেশিক ধারাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ও নিজস্ব মতাদর্শের অনুসরণে দেশ গড়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

---

*গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ–লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২.২ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মৌলিক বিষয় হলো বিনিয়োগ বনাম ভোগের সমস্যা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ভোগ থেকে সরিয়ে বিনিয়োগে জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা ছাড়া অর্থনৈতিক বিকাশের আর কোন বিকল্প নেই"[১]। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মতবাদের মূল সমস্যা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি অর্থনীতি, পূর্বে যার জাতীয় আয়ের ৪ বা ৫ শতাংশ বা তার কম সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করত; তা থেকে সঞ্চয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ১২ থেকে ১৫ শতাংশে রূপান্তরিত করতে হবে। এটি মূল সমস্যা এ জন্য যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বিষয় হলো দ্রুত পুঁজি সংগ্রহ (পুঁজির সাথে জ্ঞান ও দক্ষতা সহ)।[২]

২.৩ অর্থনীতিতে দু'টো-ফাঁক মতবাদ (Two-gap Theory) রয়েছে ; (ক) সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক (Saving-Investment Gap) ও (খ) রপ্তানি-আমদানি ফাঁক (Export-Import Gap)। উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে ব্যবধানের কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২.৪ উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা সারণী-১এ দেখা যায় ঃ

সারণী-১

কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা

দেশ	সঞ্চয় (জিডিপি'র শতাংশ)		বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	
	১৯৭০	১৯৯২	১৯৭০	১৯৯২
বাংলাদেশ	৭	৬	১১	১২
নেপাল	৩	১২	৬	২২
ভারত	১৬	২২	১৭	২৩
পাকিস্তান	৯	১৪	১৬	২১
শ্রীলংকা	১৬	১৫	১৯	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৭	৩৫	২২	৩৪

উৎস্য ঃ World Development Report 1994, pp 178-179

1 Gonnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions.* (London : Gerald Duckworth & Co. Ltd. 1959)

2 W. Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and SP Sing (ed). *The Economics of Underdevelopment* (New Delhi, Oxford University Press, 1982) P. 416

২.৫ সঞ্চয় বিনিয়োগ ফাঁকের অনুরূপ রপ্তানি-আমদানি ফাঁক পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের গত ছ, বছরের রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে ব্যবধান সারণী -২ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-২
বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির প্রবণতা

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রপ্তানি	আমদানি	উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-)
১৯৮৬-৮৭	৩,৩৬৮	৬,৮৫০	-৩,৪৮২
১৯৮৭-৮৮	৪,১১৬	৯,১৫৯	-৫,০৪৩
১৯৮৮-৮৯	৪,২৬৯	৯,৫০৮	-৫,২৩৯
১৯৮৯-৯০	৫,১৪১	১১,৩৩০	-৬,১৮৯
১৯৯০-৯১	৬,০২৭	১১,১৫৫	-৫,১২৮
১৯৯১-৯২	৭,৪২২	১৩,২২৪	-৫,৮০২

উৎস ঃ Statistical Pocket Book of Bangladesh 1993, pp. 205

২.৬ সারণী-১ ও সারণী -২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়ের ঘাটতি রয়েছে এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প নেই।

৩.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উৎস

৩.১ একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ প্রধানত দু'টো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে; (ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব। কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকেই কর বলে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্বের আশি ভাগেরও বেশি কর থেকে সংগৃহীত হয়, সেহেতু নিবন্ধের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কর রাজস্ব। কর দু' প্রকার; (১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। যে ব্যক্তির ওপর কর ধার্য করা হয়েছে যদি শেষ পর্যন্ত তাকেই করের আর্থিক ভার বহন করতে হয় তাহলে এরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ যে করের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব অর্থাৎ করঘাত (Impact) ও চূড়ান্ত প্রভাব অর্থাৎ করপাত (Incidence) একই ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ওপর পড়ে তা প্রত্যক্ষ কর। আয়কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। অপরপক্ষে যদি করদাতা করের চূড়ান্ত প্রভাব নিজের ওপর থেকে সরিয়ে অপর ব্যক্তির ওপর ফেলতে পারেন, তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে। এক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত পৃথক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ওপর পড়ে। আমদানির ওপর শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

৩.২ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ দু'টো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে ঃ
(ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব।

ক. কর রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত

১) আয় ও সম্পদ কর (প্রত্যক্ষ কর)

২) পণ্য ও অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর কর (আমদানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর)

৩) অন্যান্য কর (মোটর যানবাহন কর, বিদ্যুৎ শুল্ক, ষ্ট্যাম্প শুল্ক ইত্যাদি)।

খ. কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত

১) সরকারী সম্পত্তি থেকে আয় (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ)

–সুদ থেকে প্রাপ্তি

–অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি থেকে আয়, যথা–বন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি

২) ফি ও আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি, যেমন টেলিভিশিণ, রেডিও, ভিসিআর রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদি।

৪.০ বাংলাদেশের কর কাঠামো

৪.১ বাংলাদেশের কর কাঠামো সম্পর্কে সারণী–৩ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে এবং রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা সারণী–৪ এ দেখা যেতে পারে ঃ

সারণী–৩

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত খাতওয়ারী রাজস্ব আদায় বিবরণী ১৯৯১–৯২–১৯৯৩–৯৪

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯১–৯২	%	১৯৯২–৯৩	%	১৯৯৩–৯৪	%
আমদানি/রপ্তানি শুল্ক	২৭৪৬.০২	৩৩.৩৭	২৮৭৫.৭২	৩৩.৬৯	২৯৮৩.৫৮	৩৩.১৭
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১২৬৯.৭৪	১৭.২৮	১৭৩১.৭৭	২০.২৯	১৭১৩.৪৯	১৯.০৫
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	২৫.৭১	০.৩৫	৩১.১২	০.৩৬	৭০.৪১	০.৭৮
বাণিজ্যসম্পৃক্তমোট ঃ	৪০৪১.৪৭	৫৫.০০	৪৬৩৮.৬১	৫৪.৩৪	৪৭৬৭.৪৮	৫৩.০০
আবগারী শুল্ক	১৪০৩.৩৫	১৯.১০	৩৩০.৯০	৩.৮৭	১৫৭.৯৭	১.৭৬
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে)	৪৬৫.৫৩	৬.৩৪	৮৩১.৯৬	৯.৭৪	১০৩২.৭৫	১১.৪৮
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে)	২৬.০১	০.৩৫	৯৮১.২৩	১১.৫০	১১৮২.৪০	১৩.১৫
স্থানীয় উৎপাদন সম্পৃক্ত মোট ঃ	১৮৯১.৮৯	২৫.৭৯	২১৪৪.০৯	২৫.১১	২৩৭৩.১৪	২৬.৩৯
আয়কর	১২৯৪.০৩	১৭.৬১	১৬১৩.১৫	১৮.৮৯	১৭০৪.৯০	১৮.৯৫
অন্যান্য কর	১১৭.৩৪	১.৬০	১৪১.৯৩	১.৬৬	১৫০.০১	১.৬৬
সর্বমোট	৭৩৪৭.৭৩	১০০	৮৫৩৭.৭৮	১০০	৮৯৯৫.৫১	১০০

উৎস ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৩–৯৪, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পৃষ্ঠা–৪ (১৯৯১ সনের ১লা জুলাই থেকে আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় করের (ব্যতিক্রম ব্যতিত) স্থলে ভ্যাট আরোপ করা হয়।)

সারণী–৩ এ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১–৯৪ সময়কালে মোট করের ৮০% ভাগের বেশি পরোক্ষ কর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ করের মধ্যে আমদানি–রপ্তানি শুল্ক, আবগারী, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর উল্লেখযোগ্য। এ সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য সম্পৃক্ত (আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে) করের অবদান স্থানীয় উৎপাদন সম্পৃক্ত করের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৯১–৯২ অর্থ বছরে যে হারে আবগারী শুল্ক আদায় হয়েছে (১৯.১০%) পরবর্তী অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৯২–৯৩ ও ১৯৯৩–৯৪ বছরে এ উৎস থেকে আদায়ের পরিমাণ তার থেকে অত্যধিক হারে (যথাক্রমে ৩.৮৭% ও ১.৭৬%) কমেছে। এর কারণ হচ্ছে ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে অধিকাংশ আবগারী শুল্কের পরিবর্তে মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়।

সারণী–৪

বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা ঃ ১৯৯১ – ৯২ – ১৯৯৩ – ৯৪

(কোটি টাকায়)

১। করসমূহ থেকে প্রাপ্তি ঃ	**১৯৯১–৯২**	**১৯৯২–৯৩**	**১৯৯৩–৯৪***
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭৩৪৭.৭৩	৮৫৩৭.৭৮	৮৯৯৫.৫১
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত	৫৫৩.০০	৬১৭.২০	৬৮৩.৫৬
করসমূহ থেকে মোট প্রাপ্তি ঃ	৭৯০০.৭৩	৯১৫৪.৯৮	৯৬৭৯.০৭
২। কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৯১৬.০০	২০৬৭.০০	২৫৪৮.৭৮
৩। জিডিপি (বাজার মূল্যে)	৯০৬৫০.২০	৯৬৮৮০.৪০	১০১৪৩৩.৭৮**
৪। জিডিপি তে কর রাজস্বের অবদান	৮.৭২%	৯.৪৫%	৯.৫৪%
৫। জিডিপি মোট রাজস্বের অবদান	১০.৮৩%	১১.৫৮%	১২.০৬%

৪.২ বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ক) উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জিডিপি তে রাজস্বের অবদান কম। বিগত তিন বছরে এ হার মোটামুটিভাবে বেড়েছে। ১৯৯১–৯২ অর্থ বছরে এ হার ছিল ১০.৮৩%, ১৯৯২–৯৩ এবং ১৯৯৩–৯৪ অর্থ বছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১.৫৮% এবং ১২.০৬% তে দাঁড়িয়েছে।

---

* সাময়িক তথ্য ভিত্তিক।

** প্রবৃদ্ধি ৪.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি অনুমান সাপেক্ষে।

উৎস ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৩–৯৪, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পৃঃ ৩।

খ) অনুরূপভাবে জিডিপি তে কর রাজস্বের অবদান বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এ হার ছিল ৮.৭২%, ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এ হার ৯.৫৪% উন্নীত হয়।

গ। দেশের রাজস্বের সিংহভাগ এখনও পরোক্ষ কর থেকে আদায় হয়। তার মধ্যে বহিঃশুল্কের অবদান সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৩-৯৪ সনে আমদানী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগ্রহীত মোট রাজস্বের ৫৩ শতাংশ আদায় হয় এ খাত থেকে। স্থানীয় পরোক্ষ করের (আবগারী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক) হিস্যা ২৬.৩৯ শতাংশ, অর্থাৎ পরোক্ষ কর থেকে মোট প্রাপ্তি ৭৯.৩৯ শতাংশ।

ঘ। পরোক্ষ করের প্রায় এক চতুর্থাংশ আসে দেশীয় দ্রব্যের ওপর থেকে। মাত্র কয়েকটি দ্রব্য যথা তামাক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও পাটজাত দ্রব্যের ওপর থেকেই উল্লেখযোগ্য অংশ সংগৃহীত হয়। ১৯৯১-৯২ থেকে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ফলে অধিক পণ্য ও সেবা করের আওতায় এনে এর পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।

ঙ। ব্যক্তিগত আয় থেকে সংগৃহীত আয়কর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মাত্র ১৮.৯৫ শতাংশ।

চ। প্রত্যক্ষ করের প্রায় ৭৫% ভাগ যৌথ কারবার (Corporate Tax) থেকে আসে।

ছ। অন্যান্য কর বাবদ ১.৬৬ শতাংশ আদায় হয়েছে।

জ। ১৯৯৩-৯৪ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগ্রহের পরিমাণ দেশের মোট রাজস্বের ৭৩.৫৭ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯২.৯৪ শতাংশ।

৪.৩ এছাড়া করকাঠামো অসম, কারণ (ক) কৃষি আয়কে কর থেকে রেহাই এবং (খ) কর ছুটি ব্যক্তিগত আয় করের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরায়। এ ধরনের কিছু সমস্যার সমাধান বিশেষ করে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধানকল্পে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানি স্তরে প্রাথমিক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের সুপারিশ করে।(৩) বাংলাদেশ সরকার ১লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানি স্তরে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করেছে। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে আলোচনার আগে মূল্য সংযোজন কী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

---

৩ The Workd Bank, *Bangladesh : An Agenda for Tax Reform, Vol. 1; Executive Summary and Overview*, December 15, 1989, p. 15

৫.০ মূল্য সংযোজন কী?

৫.১ মূল্য সংযোজন বলতে কোন চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় এবং উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়।

মূল্য সংযোজন করের ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

মূল্য সংযোজন= চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় — কাঁচামালের ব্যয়

উদাহরণ ঃ তূলা → সূতা → কাপড় → তৈরি পোষাক

সারণী−৫

চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয়, কাঁচামালের ব্যয় ও মূল্য সংযোজন

উৎপাদন স্তর	চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	কাঁচামালের ব্যয় (টাকা)	মূল্য সংযোজন (টাকা)
তূলা	১৫	০	১৫
সূতা	২৫	১৫	১০
কাপড়	৪০	২৫	১৫
তৈরী পোষাক	৬০	৪০	২০
মোট	১৪০	৮০	৬০

৬.০ মূল্য সংযোজন কর

৬.১ মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে মোট উৎপাদিত পণ্য মূল্যের ওপর আরোপিত কর থেকে মোট উপকরণ মূল্যের উপর আরোপিত করের বিয়োগফল। সারণী−৬ থেকে মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৭.০ বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করের প্রধান বৈশিষ্ট্য

৭.১ মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি ব্যাপক। শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়াজাত অধিকাংশ দ্রব্যাদি এবং তালিকাভুক্ত ৩১টি সেবার ওপর বিদ্যমান আবগারী শুল্কের বদলে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া, আমদানির ওপর প্রচলিত বিক্রয় করের বদলে এই কর আরোপ করা হয়েছে।

৭.২ একক স্তর বিশিষ্ট কর ব্যবস্থার প্রবর্তন। পূর্বে কোন উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয়ের সময় একবার এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় আবার কর দিতে হতো; কিন্তু মূল্য সংযোজন কর দৈত্ব করের অবসান ঘটিয়ে কেবল উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়ের উপর ধার্য করা হয়েছে এবং উপকরণ ক্রয়ের সময় যে কর দেয়া হয়, তা বাদ দিয়ে নীট অংশটুকু কর হিসেবে জমা দিতে হয়।

সারণী—৬
মূল্য সংযোজন কর

আমদানিকৃত উপকরণ নির্ধারিত মূল্য *৩০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর=৪৫ টাকা মূল্য সংযোজন করসহ অনুমিত মূল্য ৩৪৫ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদিত মূল্য ৬০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর=৯০ টাকা প্রদত্ত নীট কর ৯০ টাকা–৪৫ টাকা=৪৫ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন মূল্য ৮০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর=১২০ টাকা প্রদত্ত নীট কর ১২০ টাকা–৯০ টাকা=৩০ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন মূল্য ১০০০ টাকা মূল্য সংযোজন কর=১৫০ টাকা প্রদত্ত নীট কর ১৫০ টাকা–১২০ টাকা=৩০ টাকা	
আমদানি পর্যায়	প্রথম উৎপাদক	দ্বিতীয় উৎপাদক	তৃতীয় উৎপাদক	
সরকারি রাজস্ব ৪৫ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৪৫ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৩০ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৩০ টাকা +	মোট সরকারি রাজস্ব ১৫০ টাকা

*খরচ, বীমা ও মাশুল মূল্য (সি. আই. এফ) + আমদানি শুল্ক + উন্নয়ন সারচার্জ

৭.৩ মূল্য সংযোজন করের আওতাভূক্ত সকল উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে একটি একক হার চালু করা হয়েছে যা শতকরা ১৫ ভাগ।

৭.৪ রপ্তানিকৃত চূড়ান্ত পণ্যে কোন কর আরোপ করা হয়না এবং রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল প্রকার কর ফেরৎ দেয়া হয়। এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৭.৫ যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক টার্ন–ওভারের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা বা তার ঊর্ধ্বে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়। ১৫ লক্ষ টাকার নিচের প্রতিষ্ঠানের ওপর শতকরা ২ ভাগ হারে টার্ন–ওভার ট্যাক্স আরোপ করা হয়।

৭.৬ কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর কোন প্রকার মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয় না।

৭.৭ মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হয় শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের সময়ে।

৭.৮ এ অবস্থায় করদাতাদের কর এড়ানোর সুযোগ কম। এ নতুন কর ব্যবস্থায় উপকরণ রেয়াতের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি পরীক্ষা এবং কর ভার উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বন্টনের জন্য কর এড়ানোর সুযোগ কমে আসে। এ অবস্থায় রেয়াত কার্যকর হবার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতাগণ দলিলপত্র (বিক্রয় পুস্তক, ক্রয় পুস্তক ও চলতি হিসাব

পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজ থেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

৭.৯ বিলাসজাত এবং সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এবং সেবার ওপর শতকরা ১০ থেকে ৩৫০ ভাগ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

৭.১০ সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় উৎপাদনকে (যা আবগারী শুল্কের প্রধান উৎস) ১৯৯২-৯৩ সনে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে।

৭.১১ যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্ণওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দন্ডনীয় অপরাধ।

৭.১২ এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়। যদি কোন করদাতা মাসিক দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর ঃ প্রাসংগিক ভাবনা

৮.১ তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ, এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিতে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপির সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৮.২ কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দূর্বলতা হলো দূর্বল বাস্তবায়ন। VAT এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনকে VAT চালু করে প্রথম বছর দূর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে, যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু হয়[8]।

৮.৩ কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্বাবলী পুনর্বন্টণ করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির

---

[8] Omar Haider Chowdhury. *Domestic Resourec Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95)* A Paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, P 13

পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজ থেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

৭.৯ বিলাসজাত এবং সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এবং সেবার ওপর শতকরা ১০ থেকে ৩৫০ ভাগ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

৭.১০ সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় উৎপাদনকে (যা আবগারী শুল্কের প্রধান উৎস) ১৯৯২-৯৩ সনে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে।

৭.১১ যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্ণওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দন্ডনীয় অপরাধ।

৭.১২ এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়। যদি কোন করদাতা মাসিক দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর ঃ প্রাসংগিক ভাবনা

৮.১ তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ, এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিতে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপির সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৮.২ কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দূর্বলতা হলো দূর্বল বাস্তবায়ন। VAT এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনকে VAT চালু করে প্রথম বছর দূর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে, যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু হয়[৪]।

৮.৩ কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্বাবলী পুনর্বন্টণ করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির

---

৪ Omar Haider Chowdhury. *Domestic Resourec Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95)* A Paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, P 13

উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। কিভাবে এ পূনর্গঠন করতে হবে তার ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

৮.৪ নতুন কর ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এ কর সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই করের উদ্দেশ্য, এর কাঠামো, গণনা পদ্ধতি, দলিলপত্র সংরক্ষণ ও আইনগত দিক সম্পর্কে কর দাতাদের অবহিত করবেন।

৮.৫ উন্নত হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য VAT কে কম্পিউটারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ কম্পিউটারের সাহায্যে উপাও তথ্যাদি সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সূসংহতভাবে করা যেতে পারে।

৮.৬ নতুন কর ব্যবস্থার সাথে মুদ্রানীতি, মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও বাণিজ্য নীতির সংগতি বিধান করতে হবে।

৮.৭ উন্নয়নশীল দেশের গণজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙখলাহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। 'কোমল রাষ্ট্র' বলে অভিহিত এসব দেশে দূর্নীতিপরায়ণতা, স্বজনপ্রীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দূর্নীতি নির্মূল করতে না পারলে মূল্য সংযোজন কর অর্থহীন হয়ে যাবে।

৮.৮ পরিশেষে বলা যায় স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান ভোগের পরিমাণ ব্যাপকভাবে ত্যাগ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনগণের কাছে একটি যথাযথ জবাবদিহি ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সম্ভব। কারণ উন্নয়ন হচ্ছে মূলত একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব।

৯.০ উপসংহার

৯.১ স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর রাজস্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন যথার্থ। এ কর প্রবর্তনকারী দেশসমুহ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে সাফল্য অর্জন করেছে।

৯.২ তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ কর ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পরোক্ষ কর ছাড়া প্রত্যক্ষ কর যথা–আয়কর ও ভূমি উন্নয়ন কর কাঠামোর (কর পদ্ধতি, করের হার, করদাতা ইত্যাদি) আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাধক্রমের উন্নয়ন অর্থনীতি মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমেদ, নাসিরউদ্দীন ও তারেক, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), ১৯৯৩, *উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন- ।

2. Chowdhury, Omar Haider, *(1990-95), Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan.* A paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA.

3. Chowdhury, Omar Haider and Hossain, Mahabub (1988), "Tax Structure of Bangladesh : An Overview" *The Bangladesh Development Studies,* Vol. XVI, No.4, December,

4. Faaland Just and parkinson, J. R. (1989), *Aid Conditionality the Governance Gap.* Dhaka : BIDS, January.

5. Government of the People's Republic of Bangladesh. *The Fourth Five Year Plan 1990-95* (Draft). Dhaka: Planning Commission, June.

6. Haque, Wahidul and Rahman, Sultan H, (1988), *An Optimal Macroeconomic Planning Model for the Bangladesh Economy : Strategies for Self-reliant Developmen.* Dhaka : BIDS.

7. Lewis, W, Arthur, (1954), "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and S.P. Singh (ed), *The Econimics of Under development.* New Delhi: Oxford University Press.

8. Myrdal, Gunnar. (1969), *Economic Theory. and Under developed Regions. London:* Gerald Duckworth & Co. Ltd.

9. Myrdal, Gunnar, (1968), *Asian Drama* (Vol. 11) London : The Penguin Press.

10. Report of the Bangladesh Tax Mission, (1990), *Value Added Tax.* January.

11. Sobhan, Rehman and Tajul Islam, (1988), "Foreing Aid and Domestic Resource Mobilisation in Bangladesh". *The Bangladesh Development Studies.* Vol. XVI, No.2, June,

12. The Workd Bank. (1989), *Bangladesh: An Agenda for Tax Reform* (in Three Volumes). December 15.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন

মোহাম্মদ আলী *

১.০ ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরী হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয়। উক্ত আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের কাজও শুরু করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়, ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে তা কার্যকর করা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা ছিল এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ছিল এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে সংবিধানের নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সময়ে সরকার পদ্ধতিতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি সংবিধানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার-ব্যবস্থা আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থিত হয়েছে। এ প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় অনেক গণতান্ত্রিক সরকার কালক্রমে কর্তৃত্বকামী সরকারে পরিণত হয়। এ ধরনের সরকার তাদের স্থায়িত্ব রক্ষার মানসে ক্রমশ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়—গণতান্ত্রিক একটি কাঠামোর মধ্যে একটি দারিদ্র্য-জর্জর সমাজের স্থিতিশীলতা কতদূর নিশ্চিত করা যায়? পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, অনগ্রসর একটি দেশে তা কতটা প্রাসঙ্গিক, তাও বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা গেছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার একটি একদলীয় সরকারে পরিণত হয়েছে। এছাড়া দু'বার সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে। কোন্ আর্থ-সামাজিক অবস্থা অথবা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকে অপরিহার্য করে তুলেছিল-সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এছাড়া অসাংবিধানিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি অনিবার্য ছিল কিনা-সে বিষয়েও আকর্ষণীয় আলোচনা হতে পারে। তবে এ লেখার পরিসরে তা করা সম্ভব নয়; এ লেখার তা উদ্দেশ্যও নয়। এ লেখার উদ্দেশ্য হলো সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় এবং সংবিধানে আনীত

---

* এস্টেট অফিসার, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিভিন্ন সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করা। এর সাথে বিভিন্ন সময়ে সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

২.০ প্রাক–সংবিধান পর্ব

২.১ পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে দু'টো দলিল দ্বারা বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছিল। দলিল দু'টো হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও অস্থায়ী সংবিধান আদেশ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ক. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঃ ১৯৭০–৭১ সালের নির্বাচনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করা হয়। ১৭ই এপ্রিল নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পঠিত এই ঘোষণাপত্রটি ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে কার্যকর করা হয়। এতে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় ঃ

"till such time as a constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic.

and shall exercise all the Executive and legislative powers of the Republic including the power to grant pardon.

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary.

shall have the power to levy taxes and expend moneys.

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly.

and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

উক্ত ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ–রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে উল্লেখ করা হয়।

খ. সাময়িক সংবিধান আদেশ ঃ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী সাময়িক সংবিধান আদেশ জারী করেন। এই আদেশের মাধ্যমে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সাময়িক সংবিধান আদেশের ৫ এবং ৬ নং ধারায় বলা হয় ঃ

"5. There shall be a Cabinet of Ministers with the Prime Minister at the head.

6. The President shall in exercise of all his functions act in accordance with the advice of the Prime Minister."

২.২ সাময়িক সংবিধান আদেশকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি আদেশের বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (The laws continuance enforcement order)। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত এই আদেশে পাকিস্তান আমল থেকে চলমান সকল আইন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুমোদনসাপেক্ষে বৈধকরণ ও কার্যকর করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব আইন সামঞ্জস্যবিহীন বলে গণ্য হবে সে সমস্ত আইন কার্যকর করা যাবে না। কোন প্রকার আইনগত শূন্যতা পরিহার করার লক্ষ্যে এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়।

৩.০ সংবিধান প্রণয়ন

৩.১ বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করা হয়। উক্ত আদেশ দ্বারা ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া অন্যকোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সম্ভবত পাকিস্তান আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ রেখেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে প্রথম গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের পাশাপাশি আইন প্রণয়নেরও দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এর ফলাফল শুভ হয়নি। উক্ত গণপরিষদ দীর্ঘ সময়ের পরও একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। পরিণামে গণপরিষদের অপমৃত্যু ঘটে।

৩.২ যাই হোক, সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল বৈঠকে মিলিত হয়। দু' দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন ঃ

১। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ২। তাজউদ্দিন আহমদ, ৩। খন্দকার মুশতাক আহমেদ, ৪। এ এইচ এম কামরুজ্জামান, ৫। এম আব্দুর রহিম, ৬। আব্দুর রউফ, ৭। মোঃ লুৎফর রহমান, ৮। আব্দুল মমিন তালুকদার, ৯। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ১০। মোঃ বায়তুল্লাহ, ১১। আমিরুল ইসলাম, ১২। বাদল রশীদ বার এট ল', ১৩। খন্দকার আব্দুল হাফিজ, ১৪। মোঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, ১৫। শওকত আলী খান, ১৬। মোঃ হুমায়ুন খালিদ, ১৭। আছাদুজ্জামান খান, ১৮। এ কে মোশাররফ হোসেন আখন্দ, ১৯। আব্দুল মমিন, ২০। শামসুদ্দিন মোল্লা, ২১। শেখ আব্দুর রহমান, ২২। ফকির সাহাব উদ্দিন আহমদ, ২৩। আব্দুল মুনতাকীম চৌধুরী, ২৪। অধ্যাপক খুরশেদ আলম, ২৫। সিরাজুল হক, এ্যাডভোকেট, ২৬। দেওয়ান আবুল আব্বাছ, ২৭। হাফিজ হাবিবুর

রহমান, ২৮। মোঃ আব্দুর রশীদ, ২৯। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ৩০। নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ৩১। মুহাম্মদ খালেদ, ৩২। বেগম রাজিয়া বানু, ও ৩৩। ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল

৩.৩ ১৯৭২ সলের ১৭ই এপ্রিল সংবিধান-প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে কমিটির কাছে প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। এর ফলে ৯৮ টি স্মারকলিপি পাওয়া যায়। সাইক্লোস্টাইল পদ্ধতিতে সেগুলো মুদ্রিত করে কমিটির সদস্যদের কাছে বিলি করা হয়। সদস্যগণ সেসব পরামর্শ বিবেচনা করেন।

৩.৪ ১৭ই এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক দিনের জন্য মুলতবির পর ১০ই মে থেকে ২৫শে মে পর্যন্ত আবার একাধিক্রমে বৈঠক চলতে থাকে। এসব বৈঠকে প্রতিটি বিধান নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়। ফলে বেশিরভাগ অনুচ্ছেদ ও দফা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৫ ২৫শে মে তারিখে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খসড়া বিধানাবলী নিয়ে সদস্যগণ যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার ভিত্তিতে সংবিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং ৩রা জুন তারিখে কমিটির বৈঠক আবার শুরু হলে খসড়াটি উপস্থাপন করা হয়। কমিটি এই খসড়াটি দফাওয়ারী আলোচনা করেন এবং বেশ কিছু সংশোধনীসহ ১০ই জুন তারিখে খসড়াটি অনুমোদন করেন।

৩.৬ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া সংবিধানটি আইনগত খসড়া-রচনাকারীদের (টেকনিক্যাল ড্রাফট্স্ম্যান) দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এছাড়া সংবিধানের ভাষাগত উন্নতি সাধনের জন্য জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ আনিসুজ্জামানকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি খসড়া পরীক্ষা করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া সংবিধানের ভাষাগত পরিমার্জন করা হয়।

৩.৭ অতঃপর ১৯৭২ সালের ১৮ই অক্টোবর ৬জন সদস্যের মতানৈক্যমূলক বক্তব্যসহ খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উপস্থাপন করা হয়। এই ৬ জন সদস্য হলেনঃ

১। আছাদুজ্জামান খান, ২। এ,কে,এম, মোশাররফ হোসেন আখন্দ, ৩। আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী, ৪। হাফিজ হাবিবুর রহমান, ৫। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ৬। ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল।

৩.৮ দীর্ঘ আলোচনার পর গণপরিষদে ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষরদানের জন্য গণপরিষদ সদস্যগণ পুনরায় মিলিত হন। ঐদিন গণপরিষদের স্পীকর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ সংবিধানের মূল বাংলা লিপি এবং এর ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর দিয়ে সংবিধানকে প্রমাণীকৃত করেন। এভাবে বিধিবদ্ধ সংবিধান পরবর্তী বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসিম্বর থেকে কার্যকর হয়।

৪.০ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

৪.১ একটি প্রস্তাবনা, চারটি তফশীল ও ১৫৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আবার ১১ভাগে বিভক্ত হয়। ভাগগুলো হলো ঃ

ভাগ	বিষয়	অনুচ্ছেদ
১ম	প্রজাতন্ত্র	১-৭
২য়	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৮-৫
৩য়	মৌলিক অধিকার	২৬-৪৭
৪র্থ	নির্বাহী বিভাগ	৪৮-৬৪
৫ম	আইন সভা	৬৫-৯৩
৬ষ্ঠ	বিচার বিভাগ	৯৪-৯৭
৭ম	নির্বাচন	১১৮-১২৬
৮ম	মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭-১৩২
৯ম	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	১৩৩-১৪১
৯মক	জরুরী বিধানাবলী	১৪১ক-১৪১গ
১০ম	সংবিধান সংশোধন	১৪২
১১শ	বিবিধ	১৪৩-১৫৩

৪.২ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে এবং জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকার, মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা।

৫.০ সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে এযাবৎকাল মোট তেরটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এর ফলে সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. প্রথম সংশোধন ঃ ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই তারিখে সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন ১৯৭৩ পাশ হয়। এটি ১৯৭৩ সালের ১৫ নম্বর আইন। এর দ্বারা

সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের ২ দফার পর নতুন ৩ দফা এবং ৪৭ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়। গণহত্যাজনিত অপরাধের বিচার করার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন আনা হয়।

খ. দ্বিতীয় সংশোধন ঃ ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইন এর মাধ্যমে নবম ক ভাগ সংযোজন করা হয়। এছাড়া সংবিধানে ২৬, ৬৩, ৭২, ও ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন এবং ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা ঘোষণার আইনগত ভিত্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই সংশোধন আনা হয়।

গ. তৃতীয় সংশোধন ঃ সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৭৪ নং আইন) পাশ হয় ১৯৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর। এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের সীমানা পুনঃনির্ধারণের বিধান প্রণয়নই এ সংশোধনীর উদ্দেশ্য।

ঘ. চতুর্থ সংশোধন ঃ ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৫ সালের ২ নম্বর আইন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কোন বিবেচনাতেই চতুর্থ সংশোধন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়। সংবিধানে নতুন ৬ষ্ঠ ক ভাগ সংযোজন করে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয় এবং বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদস্থাপন, ছুটি মঞ্জুর, সুপ্রীম কোর্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য ১১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

ঙ. পঞ্চম সংশোধন ঃ ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৭৯ সালের ১নং আইন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তা প্রত্যাহৃত হয়। সামরিক শাসন জারীর পর রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়। এ সময়ে সংবিধানেও সংশোধনী আনা হয়। উল্লেখিত ফরমানসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধনীসমূহ পঞ্চম সংশোধন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর ফলে সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপর মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে গ্রহণ করা হয়। মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করা হয়। তবে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি বহাল রাখা হয়। উপরন্তু রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের সংশোধন ব্যবস্থা

অধিকতর জটিল করা হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও পদোন্নতি সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

চ. **ষষ্ঠ সংশোধন** ঃ সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধন আইন পাশ হয় ১৯৮১ সালের ৯ই জুলাই তারিখে। এটি ১৯৮১ সালের ১৪নং আইন। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৫১ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদ দু'টো লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হবে না বলে ঘোষণা করা। তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই সংশোধন আনা হয়।

ছ. **সপ্তম সংশোধন** ঃ ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৮৬ সালের ১ নং আইন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর তা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফরমান/আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়। আলোচ্য সংশোধনীতে উল্লিখিত ফরমান/আদেশ ইত্যাদি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের চাকরির মেয়াদ বাষট্টি বছর থেকে বাড়িয়ে পয়ষট্টি বছর করা হয়।

জ. **অষ্টম সংশোধন** ঃ ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন তারিখে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানে ২ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে অন্যন্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হাইকোর্টের বিকেন্দ্রিকরণ। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। এছাড়া এ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ইংরেজী–লিপির ৩ অনুচ্ছেদে Bengali শব্দের স্থলে Bangla এবং ৫ অনুচ্ছেদে Dacca এর স্থলে Dhaka শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ সংক্রান্ত অংশটি সংবিধান বহির্ভূত, অকার্যকর ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

ঝ. **নবম সংশোধন** ঃ ১৯৮৯ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সংবিধানের নবম সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এটি ১৯৮৯ সালের ৩৮ নং আইন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি পদে রাষ্ট্রপতি পদের ন্যায় সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া রাষ্টপতি বা উপরাষ্ট্রপতি একাধিক্রমে দু'মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ থেকে এ সংশোধন কার্যকর করা হয়।

ঞ. **দশম সংশোধন** ঃ ১৯৯০ সালের ২০ই জুন তারিখে সংবিধানের দশম সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯০ সালের ৩৮নং আইন। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা প্রতিস্থাপন করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছর বাড়ানো হয়।

ট. একাদশ সংশোধন : ১৯৯১ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সংবিধানের একাদশ সংশোধন আইন পাশ হয়। এটি ১৯৯১ সালের ২৪নং আইন। এর মাধ্যমে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ, দায়িত্ব পালন এবং তাঁর প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

ঠ. দ্বাদশ সংশোধন : ১৯৯১ সালের ৬ই আগষ্ট জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন গৃহীত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইন গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যগণ অভূতপূর্ব ঐক্যমত্য প্রদর্শন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের ৫ম সংশোধন আইনে এরূপ বিধান ছিলো যে, সংবিধানের প্রারম্ভ, প্রস্তাবনা, ও রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হলে রাষ্ট্রপতি তাঁতে স্বাক্ষরদানের পূর্বে গণভোটের আয়োজন করবেন। উক্ত বিধান অনুযায়ী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে দ্বাদশ সংশোধনীর ওপরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে দ্বাদশ সংশোধনী অনুমোদিত হয়।*

৬.০ সরকার-পদ্ধতির বিবর্তন

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তা করা হয়েছিল। এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। পরবর্তীকালে অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। এতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন বলে উল্লেখ করা হয়। এটিকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সবুজ-সংকেত হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে, রাষ্ট্রপতি যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন, মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যবস্থাকে আদর্শ সংসদীয় পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে চতুর্থ সংশোধন আইন দ্বারা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। সামরিক শাসন চলাকালে ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ফরমান (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ জারি করা হয়। এর দ্বারা সংবিধানে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলো সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন আইনে অনুমোদিত হয়। এতে চতুর্থ সংশোধন আইনের অনেকগুলো বিধান রদ করা হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ দ্বিতীয় বার সামরিক শাসন জারী করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৯১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১৯৯১

---

* এই লেখা ছাপাখানায় যাওয়ার পর সংবিধানের এয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ পাশ হয় তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

সালের ৬ই আগষ্ট জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধন আইন গৃহীত হয় এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটে তা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটিকে পবিত্র দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে একথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ নিযুত-প্রাণের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আর সংবিধান হচ্ছে স্বাধীনতার অন্যতম ফসল। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, আর জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধান হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, কালের প্রবাহের সাথে সাথে রাষ্ট্রের কাজের ধরন বদলে যায় এবং রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশারও পরিবর্তন ঘটে। তাই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রতিটি সংবিধানেই সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান এ যাবৎ তের বার সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধনীগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী জনগণের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে আবার সেখান থেকেই নতুন করে যাত্রা শুরু হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত অর্থে সাংবিধানিক শাসনের বিকাশ ঘটেছে এমনটি বলা যাবে না। তবে যাত্রা শুরু হয়েছে, এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। এই প্রত্যাশার তাৎপর্য অপরিসীম।

বি ঃ দ্র ঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (দলিলপত্র তৃতীয় খন্ড)*, পৃঃ ৪ ও ৭।

২। নাথ, বিপুল রঞ্জনঃ ১৯৮২, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দলিল*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, পৃঃ ৫০-৫১

৩। আহমেদ, মওদুদঃ ১৯৮৩ *বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল;* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃঃ ১১৮-১১৯ ও ১৩৫।

৪। রহমান, গাজী শামছুরঃ *বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য;* পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১১৮৫-১২৪৬।

৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা জুলাই ১৯৯১, এবং ৭ ও ৮ আগস্ট ১৯৯১।

৬। দৈনিক সংবাদ ২রা জুলাই, ১৯৯১।

৭। Bangladesh Observer, 16 August, 1991

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ*

১.০ ভূমিকা

১.১ ভূমি ব্যবস্থাপনার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার দেওয়ানী লাভের পূর্বে এ উপমহাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার তেমন কোন বিধিবদ্ধ নীতিমালা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সুবিধেমত শাসনকর্তারা ভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অবলম্বন করতো।

১.২ উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন হিন্দু শাসন আমল, মুসলিম শাসন আমল এবং ব্রিটিশ শাসন আমল।

১.৩ পরিশেষে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে ভূমিব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

২.০ হিন্দু শাসন আমল

২.১ হিন্দু শাসন আমলে ভূমির মালিকানা বা উৎপাদিত ফসলের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষকে দেখা যায়। রাজা, গ্রামীণ সমাজ এবং চাষী। হিন্দু শাসনামলে কৃষি কাজ বা চাষাবাদই ছিল সমাজের প্রধান কর্ম বা পেশা। চাষাবাদের ওপর তাদের জীবিকা, জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। চাষী উৎপাদিত ফসলের একটি বড় অংশ পেত। সমাজের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা Headman বা গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত গ্রাম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। গ্রাম সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের বিনিময়ে ভূমির উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ লাভ করতো।

২.২ অনুরূপভাবে রাজা রাজ্যের সর্বময়কর্তা হিসেবে প্রজা বা চাষীদের জানমালের হেফাজতকারী হিসেবে ভূমির উৎপাদিত ফসলের এক অংশ পেতেন। মনুসংহিতা বা মনুরবিধানে ভূমির একচ্ছত্র বা চূড়ান্ত মালিকানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট বা পরিষ্কারভাবে কিছু লিপিবদ্ধ নেই। তবে রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি বা কর্তা হিসেবে 'ভূমির মালিক রাজা' মর্মে যুক্তি দেখানো হয়েছে। অপরদিকে চাষীর স্বত্বাধিকারের বিষয়ে মুনি-ঋষিগণের মত এ রূপ-"চাষোপযোগী বা কৃষিভূমির মালিক সেই, যে উহার জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করছে"।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩.০ মুসলিম শাসন আমল

মুসলিম শাসনামলে ভারত বিজয়ের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা মতবাদ থাকলেও হিন্দু শাসনামলের অনেক নীতি ও পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলিম মতবাদ অনুসারে চাষাবাদী জমি যে কৃষক বা চাষী প্রথম আবাদ করতো, সেই ভূমির মালিকানা লাভ করতো এবং এর বিনিময়ে চাষীকে উৎপাদিত ফসলের এক–দশমাংশ বা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর বা খাজনা প্রদান করতে হতো। তবে হিন্দু শাসনামলের ন্যায় ভূমির ওপর অধিকার রাজা বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকত।

৪.০ ব্রিটিশ শাসন আমল

৪.১ ১৭৫৭ সালে পলাশীতে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার ইংরেজের নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে এ দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক বিপর্যয় ঘটে। সকল ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। তখন সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব।

৪.২ ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পর বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরেজদের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন ধারণা/জ্ঞান ছিল না। তদুপরি ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে তখনো কোন লিখিত নিয়ম ও পদ্ধতি ছিলনা। প্রথম দিকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু ও মুসলিম শাসন আমলের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল এবং দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেশীয় কর্মচারিদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের ভূমি ব্যবস্থাপনার অনভিজ্ঞতার সুযোগে এ দেশের নায়েবগণ কারচুপি ও তহবিল তসরূপ করে। অন্যদিকে ১৭৬৯–১৭৭০ইং/১১৭৬ বাংলা সনে এ দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত। দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক–তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। এ সময় ভূমি রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রয়্যালটি দিতে অসুবিধায় পড়ে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৯ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানকে অপসারণ করে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা তদারক করার জন্য প্রত্যেক পরগনার জন্য একজন ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও এ সকল পরগনায় রাজস্ব আদায়ের কোন উন্নতি সাধিত হয়নি।

৪.৩ ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সনে প্রথম গভর্ণর (পরে ১৭৭৩ সনে গভর্ণর জেনারেল) নিযুক্ত হয়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেক্টর নিয়োগ করে ভূমি রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজের হাতে নেয় এবং জমির খাজনা বৃদ্ধির জন্য ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর অনুকূলে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করে, যা পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এ সময় জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধিতে আপত্তি জানালে ভূমির খাজনা আদায় নিশ্চিত করার জন্য

কালেক্টরের কাজ তদারক করার নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট 'রেভিনিউ কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের অধীনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'কমিটি অব সার্কিট' গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন জেলায় ভূমি রাজস্ব আদায় তদারক করতো।

৪.৪ জমিদারবৃন্দ কর্তৃক অত্যাচার করে খাজনা আদায় ও কোম্পানীকে সম্পূর্ণ খাজনা প্রদানে গড়িমসির কারণে কোম্পানী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ৫ বছর মেয়াদী বন্দোবস্তের মেয়াদকাল সমাপ্ত হওয়ার পর ১৭৭৭ সালে এক বছর সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থাও কৃষক কিংবা প্রজাকে কৃষির উন্নতির দিকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়।

৪.৫ ব্রিটিশ সরকার এদেশে একটি স্থায়ী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশকে এ দেশে গভর্ণর জেনারেল করে পাঠানো হয়। এ দেশের অতীত ও তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায় সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহের পর লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯০-৯১ বর্ষে দশ বৎসর মেয়াদী দশ-শালা বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরস (Court of Directors) এর অনুমোদনক্রমে দশ-শালা বন্দোবস্তকে ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করা হয়।

৪.৬ ১৯৭৩ সালের ২২শে মার্চ ১নং রেগুলেশনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমির মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ উপমহাদেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। জমিদারগণকে জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতিসহ মালিকানা স্বত্ব দেয়া হয়। কৃষি সম্প্রসারণ বা কৃষি উন্নয়নের ফলে জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পেলেও জমিদারদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে অঙ্গীকার করা হয়। রেভিনিউ আদালতের (Revenue Court) কার্যধারা বা কার্যবিধি ছিল অনিয়ম, সংক্ষিপ্ত ও একতরফা। এর ফলে ১৭৯৩ সালের ২ নং রেগুলেশনের দ্বারা রেভিনিউ কোর্ট অর্থাৎ কালেক্টর ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিলোপ সাধন করে ভূমি মালিক ও জনসাধারণের মধ্যেকার বিরোধ এবং ভূমি মালিক ও তার প্রজাদের মধ্যেকার বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানী আদালত প্রবর্তন করা হয়।

৪.৭ বাদশাহী আমলে বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা ছিল। যথা-আলতামাগা (চিরস্থায়ী রাজকীয় দান), আয়মা (সুপন্ডিত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নিষ্কর ভূমি দান), মাদাদমাশ (সেবামূলক কার্য সম্পাদনের শর্তে দান), নাজারত (মসজিদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনুদান), সাইয়ুরঘাল (ফকির দরবেশের জন্য দান), জায়গীর (সামরিক বা বেসামরিক কর্মকর্তাকে বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান) ইত্যাদির প্রচলন ছিল। বাদশাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ৩৭ নম্বর রেগুলেশনে এবং আবাদশাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ১৯ নম্বর রেগুলেশনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়।

৪.৮ ভূমি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সর্বশেষ ৩০শে চৈত্রের নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা জমিদারগণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঐ দিন সূর্যাস্তের পর সংশ্লিষ্ট জমিদারী রাজস্ব বকেয়ার দায়ে নিলামে বিক্রি করার বিধান করা হয়েছিল। এ

আইন 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত। তাই জমিদারগণ যে কোন প্রকারে প্রজার নিকট থেকে খাজনা আদায় করে যথাসময়ে কোম্পানীর পাওনা পরিশোধ করে জমিদারী রক্ষার চেষ্টা করতো। ফলে প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য দিকে কোম্পানীর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।

৪.৯ ১৮০০ সনের ৮ নং রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক কালেক্টরকে প্রত্যেকটি জমিদারীর ভূমির তফসিল, খাজনার বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিষ্টার খোলার আদেশ দেয়া হয়। এ রেজিষ্টারকে 'তৌজি রেজিষ্টার' এবং ক্রমিক নম্বরকে 'তৌজি নম্বর' বলে।

৪.১০ দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ায় কোম্পানীর অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে বাকি খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জমিদারের হাত শক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। পাশ হয় Regulation VII of 1799 যা–কুখ্যাত 'হপ্তম আইন' নামে অধিক পরিচিত। এই আইনে বাকি খাজনার জন্য আদালত বা রাজস্ব অফিসারের আদেশ ব্যতিরেকে রায়তকে গ্রেফতার এবং তার ক্ষেতের ফসল, হাল, হালের গরু ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার ক্ষমতা জমিদারকে দেয়া হয়। ফলে রায়ত হয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে জমিদারের ভূমি দাস।

৪.১১ এ আইনের কুফল প্রতিভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর টনক নড়ে। পাশ হয় Bengal Land Revenue Sales Regulation, 1812. এতে রায়তকে গ্রেফতার করার অধিকার তুলে দেয়া হয় এবং সম্পত্তি ক্রোকের অধিকার খর্ব করা হয়। লাঙ্গল বা চাষের যন্ত্র এবং হালের গরু ক্রোক থেকে রেহাই পায়।

৪.১২ জমিদারগণ ভোগ বিলাসে এবং আরাম আয়েশে শহরে জীবন যাপন করতে থাকে। জমিদারীর রাজস্ব আদায় এর ব্যাপারে তেমন মনযোগী ছিল না। সূর্যাস্ত আইনের কারণে জমিদারী নিলাম হয়ে যাবে এই ভয়ে জমিদারীর অংশ বিশেষ পত্তনী প্রদান করা হত। জমিদারী করভারে জর্জরিত হয়ে পড়ার পর জমিদারী রক্ষার জন্য জমিদারীর অংশ বিশেষ পত্তনী দিয়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকারের পাওনা বা কর পরিশোধ করা হতো। মিঃ হ্যারিংটনের মতে নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে চিরস্থায়ীভাবে সৃষ্ট অধীনস্ত জোত বা জমাকে পত্তনী তালুক বুঝায়। ১৮১৯ সালের ৮নং রেগুলেশন এর মাধ্যমে পত্তনী তালুক সৃষ্টির বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৪.১৩ ০১-০৮-১৮২২ তারিখে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এর কাছে প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমি জরিপ ও স্বত্বলিপি তৈরির প্রস্তাব করা হয়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে অনুমোদন করলেও এ বিষয়ে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। Indemnity Regulation 1822 পাশ করে খুদকাস্ত রায়ত ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর রায়তকে বাকী খাজনার দায়ে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা নিলামে ক্রেতা নব্য জমিদারকে দেয়া হয়।

৪.১৪ এ আইন বাতিল করে Land Revenue Sales Act 1841 পাশ হয়। এ আইনে নতুন জমিদারকে খুদকাস্ত রায়ত ব্যতীত অন্য রায়তের খাজনা বর্ধিত হারে স্থির করার

এবং অনাদায় বা অস্বীকৃতিতে তাদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৪৫ সালে নুতন Revenue Sales Act জারি হয়; কিন্তু জমিদারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

৪.১৫ নদীর সিকস্তি ও পয়স্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন কল্পে এবং চরের জমির মালিকানা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৮২৫ সনের বঙ্গীয় এ্যালুভিয়ন ও ডিলুভিয়ন রেগুলেশন প্রণীত হয়েছিল যা পরবর্তীতে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পি ও ১৩৫/৭২, পি ও ১৩৭/৭২ এর মাধ্যমে তা আবার সংশোধন করা হয়। ১৯৯১ সনে তা বাতিলের জন্য অধ্যাদেশ জারি করার কিছুদিন পর বাতিল আদেশ আবার রহিত করা হয়।

৪.১৬ জমিদারী রক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদারগণ খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন বৃদ্ধি করে। ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ গণ-অসন্তোষ এবং এদেশ থেকে বিদেশী শাসকদের বিতাড়ণের স্পৃহা ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়; যা সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের গোচরে যায় এবং কোম্পানী থেকে শাসন ভার ইংল্যান্ডের রাণী নিজের হাতে নেয়। গণ-অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে ১৮৫৯ সালে রেন্ট এ্যাক্ট পাশ করে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। জমির নক্সা তৈরির জন্য ১৮৫৭ সালে সার্ভে আইন পাশ করা হয়। রেন্ট এ্যাক্টের বিধান বাস্তবায়নের অভাবে প্রজাদের মধ্যে গণ-অসন্তোষ থেকে যায়। তা নিরসন কল্পে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৮৭৯ সালে রেন্ট কমিশন গঠন করা হয়। প্রজার স্বার্থ রক্ষা, প্রজা, জমিদার ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি রচনা করার জন্য কমিশন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার সুপারিশ করেন। রেন্ট কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে লর্ড রিপন ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন পাশ করেন।

৪.১৭ ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক শাসন প্রদানের ফলে বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক ঋণ সালিসী আইন পাশ করায় বাংলার কৃষক সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়।

৪.১৮ ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাদের অধিকার ও স্বার্থ অনেকটা নিশ্চিত হলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষ থেকে যায়। বিভিন্ন সময়ে গণ-অসন্তোষ এর কারণে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন ৮ বার সংশোধন করা সত্ত্বেও জমিদারদের নির্যাতন বন্ধ করা যায়নি।

৪.১৯ ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়, যা ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত। ফ্লাউড কমিশন সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে নেয়ার সুপারিশ করে প্রতিবেদন পেশ করে। জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাওয়ায় তারা তার বিরোধিতা করে। প্রাদেশিক সরকার কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১৯৪৪ সালে প্রাদেশিক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটিও ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ সমর্থন করে রিপোর্ট দেয়।

৫.০ পাকিস্তান আমল

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৭ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার জন্য বিল পেশ করে। দেশ বিভাগের ফলে এই বিল পাশে বিলম্ব হয় এবং ভারত বিভক্তির পর ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিল পাশ হয় এবং এটা আইনে পরিণত হয়। এটা ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন। এ আইন পাশের ফলে এদেশে জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ হয়। পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ জমি খাস দখলে রাখা যাবে না এ সম্পর্কে এ আইনে বিবৃত হয়েছে। পরে ১৯৭২ সালে পি ও ৯৮/৭২ মূলে সর্বোচ্চ পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি ধার্য করে দেয়া হয়েছে।

৬.০ বাংলাদেশ আমল

৬.১ ১৯৮২ সালের ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ এবং ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং ক্ষেতমজুর (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী (ক) পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘার সিলিং নির্ধারণ করা হয়, তবে যে সব পরিবারে জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা বা কম তারা ৬০ বিঘার বেশি জমি সংরক্ষণ করতে পারবেন না; (খ) বর্গাচাষীরা ৫ বছরের জন্য জমি চাষের অধিকার পায়; (গ) বর্গা জমির ফসল তেভাগা ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় অর্থাৎ শ্রমের জন্য একভাগ, কৃষি উপকরণের জন্য একভাগ এবং মালিক একভাগ পাবেন; (ঘ) ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা হয় সাড়ে তিন কেজি চাল বা সমপরিমাণ অর্থ এবং (ঙ) সিলিং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন বা ১০ বিঘার কম জমির মালিক এমন কৃষক পরিবারের মাঝে বন্টন করার সিদ্ধান্ত হয়; তবে ১০ বিঘার বেশি জমি যাদের আছে তারা কেউ পাবেন না।

৬.২ ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ওপরে বর্ণিত আইন ছাড়াও আমাদের দেশে ভূমি সংক্রান্ত অনেক আইন/অধ্যাদেশ/বিধিমালা বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

ক) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন;
খ) ১৮৮২ সালের পথাধিকার আইন;
গ) ১৯৪৯ সালের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন;
১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন বিধিমালা;
ঘ) ১৯৩৫ সালের জরিপ ও ভূমি বন্দোবস্ত ম্যানুয়াল;
ঙ) ১৯৫৮ সালের জি ই ম্যানুয়েল;
চ) ১৯১৩ সালের পি ডি আর এ্যাক্ট;
ছ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ;
জ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর বিধিমালা এবং
ঞ) ১৯৮৭ সালের ভূমি উন্নয়ন কর সংশোধন অধ্যাদেশ।

৬.৩ ১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী আইন, ১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী বিধিমালা, ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ আইন ও ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। সরকার ১৯৯২

সালে–১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী আইন রহিত করেছেন এবং ১৯৯১ সালে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেছে। ১৯৯০ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালের জি ই ম্যানুয়েল বাতিল করা হয়েছে।

৬.৪ অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে, আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- i) East Pakistan Disturbed Person (Rehabilitation) Ordinance, 1964;
- ii) East Pakistan Enemy Property (Land & Buildings) Administration and Disposal Order, 1966 and
- iii) The Vested and non resident Property (Administration) Repeal) Ordinance, 1976.

৬.৫ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত আইন কানুন সমূহ নিম্নরূপ ঃ

- i) Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) order, 1972 (P.O. 16/72) and
- ii) Bangladesh Abandoned property (land, Building and any other property) Rules, 1972.

৬.৬ ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত আইন/অধ্যাদেশ/বিধিমালা

- ক) এল এ ম্যানুয়েল;
- খ) ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৪;
- গ) সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮;
- ঘ) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২;
- ঙ) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২;
- চ) স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল বিধিমালা, ১৯৮২;
- ছ) সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯।

৬.৭ ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য ১৯৮০ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন এবং ১৯৮৫ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের কার্যবিধিমালা প্রণীত হয়। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে দু'ভাগে বিভাজন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ভূমি আপীল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ভূমি আপীল বোর্ড রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে থাকে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

৭.০ উপসংহার

গত আড়াইশ' বছরে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা জনস্বার্থে আরও সহজিকরণের লক্ষ্যে অনেক কিছু করার অবকাশ আছে ।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত)– *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালী সমাজ সুবর্ণ প্রকাশনা ঢাকা।*

২। বদরুদ্দিন উমর–(১৯৭৪) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।*

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার–(১৯৮৩) *ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন*– জানুয়ারি, ।

৪। মোঃ আবদুল কাদের মিয়া–(১৯৮৯) *ভূমি জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, কাশবন মুদ্রায়ণ, ঢাকা।*

৫। ভূমি মন্ত্রণালয় (১৯৮৭) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল*–

৬। এ কে এম জাহাঙ্গীর– *মাঠ প্রশাসন।*

৭। মোঃ আবদুল কাদের মিয়া– *ম্যানুয়েল, কাশবন মুদ্রায়ন, ঢাকা।*

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মাচ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ বাংলাদেশ মোট ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ড নিয়ে গঠিত। ছোট্ট এই ভূখন্ডের ওপরে ১১.১৪ কোটি মানুষ বসবাস করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জনভারে জর্জরিত একটি দেশ। কারণ বাংলাদেশে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন লোক বসবাস করে। পৌরসভা/শহরগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫০০০ জন। তবুও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বাস করে থাকে। এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইদানীং পেশাগত পরিবর্তন সাধিত হলেও এদেশের মূল জনগোষ্ঠির জীবিকা নির্বাহের মৌলিক ভিত্তি জমি।

১.২ এজন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার, বরাদ্দকরণ, নিয়ন্ত্রণ তথা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমুদয় আইন সম্বন্ধে এদেশের প্রতিটি সুশিক্ষিত নাগরিকের ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশের ভূমি আইন সমূহের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানার আগে আমাদেরকে ভূমি আইনের পটভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, বিভিন্ন সময়ে প্রণীত এবং জারিকৃত অধ্যাদেশ ও সার্কুলারের সমন্বয়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি আইনের বিকাশ ঘটেছে। ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে ভূমি আইনসমূহের পটভূমি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের পরে এ আইনের মৌলিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

২.০ ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন ঃ

২.১ এদেশে মুসলিম শাসকবর্গের আগমনের আগে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা তেমন কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজা যেহেতু রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, সেহেতু ভূমির বা জমির মালিকও তিনিই ছিলেন। তখন যারা জমি চাষ করতো, তারা জমির উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ পেতো। বাকিটা বিভিন্ন করের

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছদ্মাবরণে রাজার কাছে চলে যেত। মুসলিম শাসন ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হবার পর এদেশের ভূমি প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

২.২ মুসলিম শাসনামলে এদেশে সুনির্দিষ্ট ভাবে কর/খাজনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুসলমানদের উদার নীতির ফলে যিনি জমি পরিষ্কার করে পতিত থাকা জমি প্রথমে চাষ করতেন তিনই জমির মালিক হতেন। উৎপন্ন ফসলের ১/১০ অংশ কর বা খাজনা (ইসলামী পরিভাষায় উশর) প্রদানের বিনিময়ে চাষী স্বাধীনভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারতেন এবং তা ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু এ সুখময় জীবন ধারায় বিপর্যয় নেমে আসে ১৭৫৭ সনে পলাশীর প্রান্তরে এদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথেই।

৩.০ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভঃ

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পরপরই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের অর্থনীতিকে পুরাপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। বকসারের যুদ্ধে মীর কাশিমকে পরাজিত করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের পরে ১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রয়্যালটির বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ-আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে।কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুযোগে এদেশের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ভূমি প্রশাসনের কাজকর্মে দূর্নীতি করা শুরু করে। অন্যদিকে ১১৭৬ সালে (ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ সাল) সংঘটিত হয় ইতিহাস খ্যাত মন্বন্তর। এ মহা-দূর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩০ - ৪০% লোক মারা যায়। ফলে ব্যাপকভাবে রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া গোষ্ঠী প্রত্যেক পরগনায় একজন ইংরেজ রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। এভাবেই ঘটলো ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ সূত্রপাত।

৪.০ পাঁচশালা বন্দোবস্ত ঃ

ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্ণর নিযুক্ত (১৭৭৩ সনে গভর্ণর জেনারেল হন) হয়েই ১৭৭২ সনে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেকটর নিয়োগ করেন। তিনি ৫ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে জমির খাজনা বৃদ্ধি করে জমিদারী বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। যা পাঁচশালা বন্দোবস্ত বা "কুইন-কুইনিয়াল" সেটেলমেন্ট নামে পরিচিত। মুসলমান জমিদারগণ এ পদ্ধতিতে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করায় জমিদারী তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অমুসলিম জমিদারদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। রেভিনিউ কালেকটরের কাজ তদারক করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট 'রেভিনিউ কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এ কাউন্সিলের অধীনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট "কমিটি অব সার্কিট" গঠন করা হয়। এই সার্কিট কমিটির সদস্যদের জেলা সদরে অবস্থান করে ভূমি রাজস্ব কার্যক্রম তদারক করার জন্য যে রেষ্ট হাউজ নির্মিত বা ব্যবহৃত হয়েছিল, সে রেষ্ট হাউজগুলিই তাঁদের নাম অনুযায়ী সার্কিট হাউজ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। তবে নব্য জমিদারগণের অসততার কারণে এ ব্যবস্থাও তেমন সুফল আনতে পারেনি।

৫.০ দশসালা বন্দোবস্ত ঃ

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ সনে ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসার পর তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন এবং পাঁচশালা বন্দোবস্তের স্থলে দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিও ইংরেজ শাসকদের কাঙ্ক্ষিত ফল দানে ব্যর্থ হয়। এজন্য রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আরও বিস্তারিত ও গভীর পর্যালোচনা শুরু করে।

৬.০ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ

৬.১ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করে ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। এ ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর রাজস্ব স্থায়ীভাবে ধার্য করা হয় এবং নূতন জমি আবাদ করে কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমিদারদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। তবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আবহমান কাল ধরে ভূমির ওপর মালিকানা ভোগকারী কৃষকগণ সর্বশ্রান্ত হয়ে পড়ে। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী প্রকারান্তরে জমির মালিক হয়ে বসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ব্যবস্থাই শুধু নিশ্চিত হয়নি, এ ব্যবস্থা ইংরেজদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আয়ের পথ নিশ্চিত করে। এভাবে প্রায় ২০০ বছর ধরে ইংরেজ জাতি বাংলার মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করার পথ প্রশস্ত করে নেয়।

৬.২ জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইংরেজরা সূর্যাস্ত আইন নামক নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করে। ১৮০০ সনে তৌজি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রজা অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং ১৮৫৭ সনে স্বাধীনতা আন্দোলনের (ইংরেজদের দ্বারা সিপাহী বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত) সূত্রপাত ঘটার পর ইংরেজরা প্রজাদের সাথে জমিদারদের সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে 'রেন্ট এ্যাক্ট' নামক একটি আইন প্রবর্তন করে। জমির নক্শা তৈরি করার জন্য ১৮৭৫ সনে সার্ভে আইন পাশ করা হয়। ১৮৮৫ সনে বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে ইংরেজরা প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালায়।

৭.০ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং ঋণসালিসি বোর্ড ঃ

১৯৩৫ সনে প্রণীত এ আইন দ্বারা স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এদিকে ১৯৩৮ সনে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ঋণসালিসি আইন পাশ করার মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

৮.০ ফ্লাউড কমিশন ঃ

৮.১ বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং বি টি এ্যাক্ট ৯/১০ বার সংশোধনের মাধ্যমে এদেশের প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রজাদের মন জয় করতে ইংরেজরা সক্ষম হয়নি। কারণ প্রজা নিপীড়ণে অভ্যস্ত জমিদারগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে

প্রজা নিপীড়ণ কমায়নি। ফলে সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৯৩৮ সনে স্যার ফ্রান্সসিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়। ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত এ কমিশন জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে প্রজাদেরকে সরাসরি সরকারের অধীনে রাখার সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী জমিদারগণ বিষয়টি তাঁদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ার কারণে এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার জন্য বিল পেশ করা হয়। কিন্তু ভারত বিভক্তির কারণে এ বিল পাশ হতে বিলম্বিত হয়। ১৯৫০ সনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পরে এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয় (১৯৫৯ সনের ২৮ নং আইন) এ আইন পাশ হওয়ার পরে সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিগ্রহণ করা এবং এস, এ, অপারেশন (রেন্টরোল অপারেশন) এর মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতি পূরণ ধার্য করণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটানো হয়।

৮.২. ১৯৫০ সনে প্রণীত জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনটিই এদেশের ভূমি আইনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী আইন। কারণ এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দু'শো বছরের জমিদারী শোষণ প্রক্রিয়াই শুধু বন্ধ করা সম্ভব হয়নি বরং এ আইনটি এদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যাপক গতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়েছিল।

৯.০ ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের মূল দিকসমূহঃ

৯.১ এ আইন নিয়ে আলোচনা করার আগেই বলে রাখা ভাল যে, এদেশে প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে এ আইনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়, এ আইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ও ভূমি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ নিবন্ধে এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

ধারা ৩/৩ (ক) ঃ এ ধারা মোতাবেক নোটিশ দিয়ে সরকার সকল মধ্যস্বত্ব (জমিদারী) অধিগ্রহণ করেছেন।

ধারা ৬/৬ (ক) ঃ জমিদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ধারা ১০/ (ক) ঃ যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ, দেবোত্তর, ট্রাষ্ট সম্পত্তি দখল করা হয়নি উক্ত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী, সেবাইত, ট্রাষ্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা ২০/২০ (ক) ঃ জমিদার মধ্যস্বত্বভোগীগণের দখলীয় জমির মধ্যে হতে ৩৭৫ বিঘা বাদে বাকি সমস্ত জমি অধিগ্রহণ হয়ে সরকারের অধীনে চলে যায়। খাজনা আদায়ের কাচারি বাড়ী, হাট বাজার পরিত্যক্ত চা বাগান, জলমহল, ফেরীঘাট ইত্যাদি সম্পত্তি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার তাদের খাস সম্পত্তি বলে রাখতে পারতেন না।

ধারা ৩৫-৩৯ ঃ অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত রেটে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ধারা ৭৫ (ক) ঃ এই আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ নোটিশ জারির পরে জমিদার আর কোন প্রজাপত্তনি (সাবলেটিং) সৃষ্টি করতে পারবে না।

ধারা-৮১ ঃ সরকার এবং প্রজার মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব থাকবে না।

ধারা-৮৩ ঃ প্রজা তার জমি সুবিধামত ব্যবহার করতে পারবেন।

ধারা-৮৪ ঃ প্রজার মৃত্যুর পর আইন অনুযায়ী স্বত্ব উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে।

ধারা-৮৫ ঃ দেওয়ানী আদালতের আদেশ ছাড়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

ধারা-৮৬ (ক) ঃ সিকস্তি ভূমির কর মওকুফ করতে হবে।

(খ) জমি সিকস্তি হলে সংশ্লিষ্ট মালিকদের স্বত্ব বিলুপ্ত হবে।

(গ) পয়স্তি জমির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(ঘ) পয়স্তি জমির বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পূর্বের মালিকগণ শর্তসাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন। সরকারী প্রচেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে যদি কোন জমি পয়স্তি হয় তবে সেক্ষেত্রে কারো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঙ) যে পয়স্তি জমির মালিকানা ২৯ শে জুন' ৭২ এর পূর্বে কর্তৃপক্ষ অথবা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি তা সরকারী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। পয়স্তি আদালতে অসমাপ্ত মামলা বাতিল হবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।

ধারা-৮৭ (ক) ঃ নদী অথবা সাগর গর্ভ থেকে জেগে উঠা নতুন চর ভূমি সরকারি খাস সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। ২৮.৬.৭২ এর আদেশে কর্তৃপক্ষ বা আদালত স্বীকৃত হয়নি। এরূপ নতুনভাবে জেগে ওঠা চর ভূমি সরকারী খাস সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ জমির মালিকানা নিয়ে কোন মামলা করা যাবে না।

ধারা-৮৮-৮৯ ঃ জমির যে কোনরূপ হস্তান্তর রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধান মতে করতে হবে।

ধারা-৯০/১ (ক) ঃ ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারির পর কোন পরিবার ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোনভাবে ৬০ বিঘার বেশি জমির মালিকানা অর্জন করতে পারবে না।

ধারা–৯০/১ (খ) ঃ ১৯৮৪ সনে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারির পূর্বে যে পরিবার ১০০ বিঘার উর্ধ্বে জমির মালিক ছিলেন, সে পরিবার ১০০ বিঘা পর্যন্ত ভূমির মালিক থাকতে পারবেন।

ধারা–৯০/২ (ক) ঃ একজন মালিক তার জমি প্রকৃত কৃষক ব্যতীত অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেনা। এবং হস্তান্তরিত জমিসহ জমি অর্জনের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

(খ) তবে যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে বৃহৎ আকারে কৃষিকার্য পরিচালনাকারী সমবায় সমিতি সমূহ রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এ উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি চাষাবাদ করতে পারবেন।

(গ) কতিপয় ভূমির মালিক সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের ভূমির মালিকানা সমিতির নিকট হস্তান্তর করলে এবং নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সনদ প্রদান করলে জমির এ উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা–৯০/৩ ঃ নির্ধারিত রাজস্ব কতৃপক্ষের পূর্ব অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি/পরিবার, শিল্প/বাণিজ্যিক/দাতব্য/ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমি মালিকানার উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি রাখতে পারে। অকৃষিজীবী ব্যক্তি নিজে বসত বাড়ি করার জন্য অথবা নিজে শ্রমিক/বরগা চাষাবাদ করার জন্য নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতিক্রমে জমি ক্রয় করতে পারেন। তবে কথিত পাঁচ বছরের মধ্যে বাড়ি নির্মান না করলে ঐ জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হবে।

ধারা–৯১ ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যক্তি বা পরিবার যদি ভূমি মালিকানা অর্জনের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে তবে অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে মালিক পছন্দমত জমি রাখার সুযোগ পাবেন এবং ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ধারা–৯২/১ ঃ কোন প্রজার স্বত্ব নিম্নলিখিত অবস্থায় বিলুপ্ত হবে ঃ

(ক) কোন উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করলে

(খ) জমি সরকারের নিকট সমর্পণ করলে

(গ) স্বেচ্ছায় বাড়িঘর ত্যাগ করে জমাজমি তিন বছর চাষাবাদ না করলে অথবা সরকারের খাজনা/কর দেয়ার ব্যবস্থা না করলে

(ঘ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পাঁচ বছরের অধিক সময়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা না নিলে।

(২) উল্লিখিত কারণে কোন হোল্ডিং এর স্বত্ব বিলোপ হলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তির দখল নিবেন এবং দখলের তারিখ হতে এ সম্পত্তির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের নিকট অর্পিত হবে।

(৩) উপধারা-২, মোতাবেক জমির দখল নেয়ার আগে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর ইচ্ছা জানাবেন এবং কারো কোন আপত্তি থাকলে তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(৪) রাজস্ব কর্মকর্তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। তবে সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করা যাবে।

ধারা-৯৩ ঃ কোন মালিক যদি তার জমির প্রজাপত্তন দেন, তবে উক্ত জমিতে তার স্বত্ব বিলুপ্ত হবে এবং উক্ত জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হবে।

ধারা-৯৫ ঃ খায়-খালাসি বন্ধক সাত বছরের অধিক দেয়া যাবে না এবং তা অবশ্যই রেজিষ্ট্রী করতে হবে।

ধারা-৯৬ ঃ কোন মালিক তার কৃষি জমি বিক্রি করলে অংশীদার এবং পার্শ্ববর্তী জমির মালিক ঐ বিক্রী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রয়োগের জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারবেন। এরূপ মামলা দায়ের করার সময় বিক্রীত জমির মূল্য এবং ক্ষতিপুরণ বাবদ অতিরিক্ত শতকরা ১০% মূল্য কোর্টে জমা দিতে হবে।

ধারা-৯৭ ঃ কোন আধিবাসী তার জমি নিজ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে রাজস্ব অফিসারের অনুমতি লাগবে।

ধারা-১০০ ঃ জমির উৎপাদন ক্ষমতার ধরন, সেচ সুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি জমির খাজনা ধার্য করতে হবে। তবে একর প্রতি খাজনার পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের ১০% এর বেশি হবে না। অকৃষি জমির খাজনা উক্ত এলাকার জমির গড় মূল্যের $\frac{}{৪}$% এবং আবাসিক এলাকার জমির খাজনা গড় মূল্যের $\frac{}{২}$% এর বেশি হবে না।

ধারা-১১৬ ঃ রাজস্ব কর্মকর্তা একজন মালিক/পরিবারের একই মৌজার সমস্ত জমির একটি খতিয়ান হোল্ডিংভুক্ত করবেন।

ধারা-১১৭ ঃ রাজস্ব কর্মকর্তা প্রজাদের আবেদনক্রমে অথবা স্ব-উদ্যোগে জমা একত্রিকরণের উদ্দেশ্যে জমা বিভক্ত করবেন।

ধারা-১১৯ ঃ কোন মৌজার দু-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক প্রজা এক বা একাধিক নিকটবর্তী মৌজার জমি একত্রিকরণের জন্য যদি আবেদন করে তবে সমগ্র মৌজার প্রজা উক্ত আবেদন করেছেন বলে ধরে নেয়া যাবে।

ধারা-১৩৫ (ক) ঃ কৃষি প্রজা জমির বার্ষিক খাজনা/কর দুই সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন।

(খ) ঃ অকৃষি প্রজা বাৎসরিক খাজনা/কর এক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৩৬ (ক) ঃ বার্ষিক খাজনা/কর সংশ্লিষ্ট বছরের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে।

(খ) ঃ প্রজা ইচ্ছে করলে অগ্রিম খাজনা পরিশোধ করতে পারবেন।

(গ) ঃ খাজনা/কর তহসিল অফিস অথবা অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে পরিশোধ করা যায়।

(ঘ) ঃ মানি অর্ডার যোগেও খাজনা/কর পরিশোধ করা যায়। খাজনা/কর সময়মত পরিশোধ না করলে তা বকেয়া দাবি হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-১৩৮ ঃ খাজনা/ কর পরিশোধকারী প্রজাকে খাজনা পরিশোধের পরে দাখিলা দিতে হবে।

ধারা-১৪১ ঃ বকেয়া খাজনা/কর পি, ডি, আর এ্যাকট্ মোতাবেক আদায় করতে হবে। তবে কৃষি উপকরণ ক্রোক এবং বসত বাড়ির উপকরণসমূহ ক্রোক করা যাবে না বা প্রজাকে সিভিল জেলে আটক করা যাবে না।

ধারা-১৪২ ঃ বকেয়া খাজনা/কর তিন বছরের মধ্যে আদায় না করলে দাবি তামাদি হয়ে যায়। সুতরাং তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হয়।

ধারা-১৪৩ ঃ কালেক্টর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেকর্ডসমূহ হাল নাগাদ করে রাখবেন। এরূপভাবে রেকর্ড হালনাগাদ করে রাখা বাধ্যতামূলক। রেকর্ড হাল নাগাদ করতে হয় নতুন প্রজার নাম রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত (জারি) করে। নতুন মালিকের নাম রেকর্ড ভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজারি বা মিউটেশন বলে। নিম্নোক্ত কারণের জন্য নামজারি (মিউটেশন) করা প্রয়োজন হয় ঃ

ক) মালিকের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত করতে হয়।

খ) জমি বিক্রি/দান/হেবার মাধ্যমে হস্তান্তরিত হলে পুরাতন মালিকের পরিবর্তে নতুন মালিকের নাম রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।

গ) সরকার জমি বন্দোবস্ত দিলে বন্দোবস্তকারীর অনুকূলে অথবা সরকার কারো জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করলে সরকারের অনুকূলে রেকর্ড পরিবর্তন করতে হয়।

ঘ) জমি সিকস্তি/পয়স্তি হলে রেকর্ড হাল নাগাদ করে খাজনা/কর পূনঃনির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়।

ধারা-১৪৪ ঃ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন জেলা বা অংশবিশেষের স্বত্বলিপি জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুত করার আদেশ দিতে পারবেন।

ধারা-১৪৪ (ক) ঃ ১৪৪/ ধারার বিধান প্রস্তুতের স্বত্বলিপি ভুল প্রমাণিত না করা পর্যন্ত সঠিক বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৪৪ (খ) ঃ রেকর্ড প্রস্তুতের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা করা যাবে না।

ধারা-১৪৬ (ক) ঃ ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড রাজস্ব কর্মকর্তাদের কাজ তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(খ) ঃ বিভাগীয় কমিশনার তাঁর বিভাগের অধস্তন কর্মকর্তাদের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং কালেক্টর তার জেলার অধীনস্থ রাজস্ব অফিসারের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ধারা-১৪৭ ঃ রাজস্ব বিভাগের আপীলেট কর্তৃপক্ষ কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনাররের নিকট আপীল করা যাবে। আর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল করা যাবে।

ধারা-১৪৮ (ক) ঃ রাজস্ব অফিসারের রায়ের বিরুদ্ধে কালেক্টরের কাছে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

(খ) ঃ কালেক্টরের রায়ের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

(গ) ঃ কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

ধারা-১৪৯ (ক) ঃ কালেক্টর স্বেচ্ছায় অথবা আবেদনক্রমে এক মাসের মধ্যে কোন অধস্তন রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

(খ) ঃ কমিশনার তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরের আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

(গ) ঃ ভূমি আপীল বোর্ড ছয় মাসের মধ্যে কমিশনারের আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

ধারা-১৫০ ঃ রাজস্ব কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় অথবা পক্ষগণের আবেদনক্রমে তাঁর নিজের আদেশ ত্রিশ দিনের মধ্যে রিভিউ করতে পারেন। তবে আপীল দায়ের করলে আদেশ রিভিউ করা যাবে না।

ধারা-১৫১ ঃ জেলা প্রশাসক ঈদগাহ, মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান, মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানের ভূমির কর মওকুফ করতে পারেন।

ধারা-১৫২ ঃ সরকার প্রজাস্বত্ব আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

১০.০ প্রজাস্বত্ব বিধিমালা- ১৯৫৫ ঃ

১০.১ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব বিধিমালা-১৯৫৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অত্যন্ত জরুরি বিধিগুলো নিম্নে বিবৃত করা হলো ঃ

বিধি-২২ ঃ রেকর্ড ব্যবস্থাপনা তহসীলদারের দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে এ বিধিতে আলোচনা করা হয়েছেঃ

(ক) ভূমি মালিকানায় কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে তহসীলদার রাজস্ব কর্মকর্তাকে দ্রুততার সাথে রিপোর্টের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

(খ) উত্তরাধিকার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল উত্তরাধিকারীকে নাম ঠিকানা ও তাঁদের হিস্যা জমির বিবরণসহ রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।

(গ) সিকস্তি ও পয়স্তি জমির পূর্ণ বিবরণসহ রিপোর্ট প্রেরণ।

(ঘ) জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংশোধনী জরিপে ছোট খাট মুদ্রণ ভুল ইত্যাদি মৌজা-ওয়ারীভাবে উল্লেখ করে রিপোর্ট দিতে হবে।

বিধি-২৩ ঃ রাজস্ব কর্মকর্তার উপরে অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা এ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিধি মোতাবেক ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধন করবেন ঃ

(ক) তহসীলদারের রিপোর্টের মাধ্যমে মৃত মালিকের স্থলে উত্তরাধিকারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন। তিনি উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতেও তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

(খ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারা মোতাবেক জমির হস্তান্তরের নোটিশ প্রাপ্ত হলে নতুন মালিকের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন।

(গ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারা মোতাবেক কর হ্রাস, অথবা জমির মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে অথবা অধিগ্রহণ হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।

(ঙ) খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হলে নতুন প্রজার নামে রেকর্ড জারি করবেন।

(চ) বর্তমানে এ বিধিটি কার্যকর নাই।

(ছ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ (৭) ধারার বিধান মোতাবেক কোর্টের আদেশ প্রাপ্ত হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।

(জ) প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৬ ধারায় জমা একত্রিকরণ এবং ১১৭ ধারা জমা খারিজ মোতাবেক রেকর্ড সংশোধন করবেন।

(ঝ) এই আইনটি বর্তমানে চালু নাই।

(ঞ) অন্যকোন কারণে রেকর্ড সংশোধন করার আবশ্যক হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।

বিধি ০২৪ ঃ রেকর্ড হালনাগাদকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার দায়িত্ব সম্পর্কে এ বিধিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিধি-২৬ ঃ ভূমি জরিপের মাধ্যমে রেকর্ড প্রস্তুতের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবেঃ

ক) প্রত্যেক মালিকের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা

খ) বর্তমানে প্রযোজ্য নয়,

গ) জমির শ্রেণী, পরিমাণ এবং দখলকারের বিবরণ,

ঘ) ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,এই বিধিগুলো বর্তমানে প্রযোজ্য নয়,

ঙ) প্রজাস্বত্বে কোন বিশেষত্ব থাকলে,

চ) সাধারণ ব্যবহার্য অধিকার থাকলে।

বিধি–২৭ ঃ জরিপ কাজের স্তর নিম্নরূপ হবে ঃ

ক) ট্রাভার্স সার্ভে,

খ) ক্যাডাষ্টাল সার্ভে,

গ) সীমানা চিহ্ন নির্মাণ/স্থাপন,

ঘ) খানাপুরি,

ঙ) বুঝারত,

চ) তসদিক,

ছ) খসড়া রেকর্ড প্রকাশনা,

জ) আপত্তি নিস্পত্তি,

ঝ) আপীল কেস নিস্পত্তি,

ঞ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুত এবং চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশনা।

বিধি ২৮ থেকে শুরু করে বিধি ৩৫ পর্যন্ত জরিপ কাজের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১১.০ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯০ঃ

১১.১ বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যতগুলো আইন আছে, তার মধ্যে এ ম্যানুয়েলটি সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ হিসেবে বিবেচিত। ১৯৫৮ সনে প্রণীত জি, ই, ম্যানুয়েল (গভর্নমেন্ট ষ্টেট ম্যানুয়েল) ১৯৯০ সনে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল। যদিও ১৯৭৬ সনে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সনে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৯ সনে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু এসব আইন/অধ্যাদেশ জারি করে যুগের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি বলে পরিবর্তিত অবস্থায় ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও সরকারের জারিকৃত নীতিমালা/নির্বাহী আদেশের আলোকে ১৯৫৮ সনে প্রণীত জি, ই, ম্যানুয়েলটি অনেকটা পুনঃ লিখন করে এ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে বলে ম্যানুয়েলের মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ম্যানুয়েল মোট ২১টি পরিচ্ছেদ এবং ৪৭৪টি বিধি নিয়ে গঠিত।

১১.২ প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংগঠন, জাতীয় ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, কালেক্টর, অতিরিক্ত কালেক্টর, সহকারী কমিশনার ভূমি, ইউনিয়ন ভূমি অফিসকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

১১.৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূমি উন্নয়ন কর, কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার (সিলিং), অকৃষি জমির উন্নয়ন কর, স্ল্যাব বা ধাপ প্রয়োগ, জমির শ্রেণী নির্ধারণ, পরিবার ভিত্তিক জমির পরিমাণ ও খতিয়ান বের করে কর নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী থানা-ওয়ারী তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত কর তালিকা প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১.৪ চতুর্থ পরিচ্ছেদে খাস জমির বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি সম্পদ ও খাস জমি বন্টন, খাস জমির সংজ্ঞা ও উৎস অনুযায়ী খাস জমি চিহ্নিত করণ, কৃষি জমির তালিকা প্রকাশ, সরকারী দপ্তরের জমির তালিকা প্রণয়ন ,আপত্তি ও আপীল নিস্পত্তিকরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের ৫৩ নং বিধিতে দরখাস্ত আহবান, ৫৬নং বিধিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ভূমিহীন বাছাই পদ্ধতি, বাতিলকৃত দরখাস্ত, ভূমি বন্টন সুপারিশ, স্বামী ও স্ত্রীর নামে যৌথ বন্দোবস্তী, সালামী, বন্দোবস্তী অনুমোদন, কবুলিয়ত, হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, রেজিষ্ট্রেশন, বন্দোবস্তী তালিকা প্রকাশ, বন্দোবস্তী বাতিল, খতিয়ান প্রণয়ন, বন্দোবস্তীর সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ, গোচারণ ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদে সিকস্তি এবং পয়স্তি আইনের কার্যকারিতা, চরের জমির মালিকানা, চরের জমি বেদখল মুক্ত রাখা, নতুন চর জরিপ, পর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ করা, রেকর্ড প্রকাশনা দ্রুত চূড়ান্তকরণ, একসালা বন্দোবস্তী, জমির তালিকা প্রণয়ন, দরখাস্ত আহবান, দরখাস্তাকরীর জমির ভিত্তিতে বাছাই, একসালা বন্দোবস্ত অনুমোদন, ইজারা মূল্য ও সময়, আপীল প্রতিবেদন দাখিল, জমি বন্দোবস্তীর দলিল ব্যতীত কোন মালিকানা সৃষ্টি না হওয়া, একসালা বন্দোবস্তীর ব্যাখ্যা, জমির জবর দখল, সাবেক মালিকের অগ্রাধিকার, রাস্তা ইত্যাদির জন্য জমি সংরক্ষণ, চর জমিতে মালিকানা, দখল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৬ অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও গুচ্ছ গ্রাম সৃজন বিষয়ক আলোচনা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। এতে পৌর এলাকার জমির শ্রেণী, অকৃষি জমি বন্দোবসতির লক্ষ্য, স্বল্প মেয়াদী লীজ, দীর্ঘ মেয়াদী লীজ, সাব-লীজ নিষিদ্ধকরণ, সালামীর পরিমাণ নির্ধারণ, স্বল্প মেয়াদী লীজের বিধি নিষেধ, সরকারী অনুমোদন, উন্নত আবাসিক এলাকা, খাসজমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, হ্রাসকৃত মূল্যে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ, সরকারী এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে জমি হস্তান্তর, ব্যক্তি বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের লীজ প্রস্তাব, বাণিজ্যিক সংস্থার নিকট জমি হস্তান্তর, দখল প্রদান, পুনঃগ্রহণ ব্যয় আদায়, পৌর এলাকায় খাস জমির তালিকা প্রণয়ন, তালিকা প্রকাশনা, আপত্তি নিস্পত্তি, বন্দোবস্ত, বন্দোবস্তী বাতিল, হোটেল/মোটেলের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত, চূড়ান্ত আদেশ, নদী

সিকস্তি জমির তালিকা প্রণয়ন ও খতিয়ান সংশোধন, বাস্তহারা পরিবারের জন্য খাস জমির চাহিদা, আবেদন পরীক্ষা, কবুলিয়াত, গুচ্ছগ্রাম সৃজনের জন্য খাস জমি, গুচ্ছগ্রাম সৃজন নীতি, গুচ্ছগ্রামের নামকরণ, আয়তন, গুচ্ছগ্রাম বাসীদের জীবিকা, পুকুর ও মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৭ সপ্তম পরিচ্ছেদে পিও নং-৯৮/৭২, এই আইনের উর্ধ্বসীমা, ব্যতিক্রম, হস্তান্তর বাতিল, জমির হিসাব দাখিল, সমর্পণের নির্দেশ, সমর্পণযোগ্য জমি নির্বাচন, ওয়াকফ/দেবোত্তর ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ নির্ধারণ, সমর্পণযোগ্য জমি নির্বাচন, জমি সমর্পণ ও গ্রহণ, আপীল ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ পদ্ধতি, বাজেয়াপ্ত, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আপীল, মামলা বারিত, রাজস্ব অফিসারের ক্ষমতা, জমির দখল গ্রহণ, সীমাতিরিক্ত জমি উদ্ধার, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৮ অষ্টম পরিচ্ছেদে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, কৃষি জমির উর্ধ্বসীমা স্পষ্টকরণ, ব্যতিক্রম, কৃষি জমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, বেনামী হস্তান্তর বেআইনী, বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ, বাস্তভিটার জন্য খাস জমি, বর্গাদারের স্বীকৃতি, বর্গাদারের মৃত্যু, মালিক কর্তৃক স্বীয় চাষে আনয়ন, চাষ অব্যাহত রাখার আবেদন, স্বীয় চাষাবাদে আনয়নের আবেদন, বর্গাচুক্তি বাতিল, সাবেক বর্গাদারের পুনর্বহাল, বর্গা ফসলের ভাগ, ফসল গ্রহণের বা রশিদ প্রদানে অস্বীকৃতি, মালিকের অংশের ফসল বিক্রয়, ক্রয়ের প্রাধিকার, অন্যের নিকট বিক্রয়, বিক্রয়াধীন জমির উর্ধ্বসীমা, বর্গাচাষের জমির উর্ধ্বসীমা, বর্গাচাষের বিধি নিষেধ, মামলা নিস্পত্তি, আপীল, আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত, ক্ষতিপূরণের হার ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে

১১.৯ নবম পরিচ্ছেদে জলমহলের শ্রেণী বিভাগ, বদ্ধ জলমহল, উন্মুক্ত জলমহল, উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায়, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় থাকা, পরীক্ষাধীন জলমহল, অনধিক তিন একরের জলমহল, প্রথানুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ, লীজ নিষিদ্ধ, খতিয়ান ভূক্তি, পরীক্ষাধীন ব্যবস্থাপনা কমিটি, হস্তান্তর চুক্তি, রেকর্ড সংশোধন, লীজ/সালামী কর জমা প্রদান, ইজারার মেয়াদ, সীমিত নিলামের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ডাক মূল্য, আলোচনার মাধ্যমে লীজ, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য লীজ, নিলাম ডাকের স্থান, নিলাম সময়সূচি, সময়সূচি প্রচার, আয়ের হিসাব প্রেরণ, নিলামের তারিখ পরিবর্তন, নিলাম ডাক গ্রহণ পদ্ধতি, ইজারা চুক্তি, পরবর্তী বৎসরের পরিশোধ সালামী, টাকা জমা দেওয়ার খাত, নিলাম অনুমোদন, কমিশনারের অনুমোদন, আপত্তি ও আপীল, জলমহলের মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১০ দশম পরিচ্ছেদে হাটবাজারের মালিকানা এবং সম্প্রসারিত বাজার এলাকায় সরকারের মালিকানা, হাটবাজারের পেরীফেরী ও নক্শা সংরক্ষণ, হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত, ইজারা পদ্ধতি, নতুন হাটবাজার প্রতিষ্ঠান বা পুরাতন বাজার বন্ধ করা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে সমঝোতার মাধ্যমে ইজারা প্রদান, পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মূল্যের হাটবাজার সমঝোতার মাধ্যমে ইজারা

নিষিদ্ধ, পাঁচ লক্ষ টাকার একটি হাট সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১১ একাদশ পরিচ্ছেদে ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর, ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনাধীন ফেরী, উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন ফেরী, জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনাধীন ফেরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ডাক মূল্য, পাটনীর প্রাধিকার, পাটনীর ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য, ইজারা মূল্য পরিশোধ, ঘাট সংরক্ষণ, ডাককারী অফিসার, ডাক কর্মসূচি, ডাকের তারিখ পরিবর্তন, ডাকমূল্য দ্বিগুণ হলে চুক্তিনামা, সাব-লেটিং নিষিদ্ধ, তোলার হার, অভিযোগ ও আপীল, আয় বন্টন, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১২ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রাজপথ আইন, লীজ, কাচারী প্রাঙ্গন, পাথর ইত্যাদি অপসারণ, পাথর ইত্যাদি আহরণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৩ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অর্পিত সম্পত্তির সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট, অনাবাসিক সম্পত্তি দখল গ্রহণ পদ্ধতি, পুনঃবেদখল, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, জেলা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, লীজ প্রদান/বাতিল, হস্তান্তর/বিলি বন্দোবস্ত লীজস্বত্ব সৃষ্টি করে না, সম্পত্তিতে প্রবেশ, সম্পত্তির শ্রেণী বিভাগ, লীজ, অকৃষি জমি লীজ, লীজ বিধ্বস্ত বাড়ীঘর, পুকুর বাগান, অস্থাবর সম্পত্তি, নিলাম ডাক পরিচালনা ও অনুমোদন, আপীল, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা, অবমুক্তি, হিসাব, লীজ গ্রহীতার সহিত পুনঃলজি, দেবোত্তর সম্পত্তি স্থগিত, বাড়ীঘর মেরামত অংশীদারকে লীজ প্রদান, অর্পিত সম্পত্তি লীজের হার, অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা স্থগিত, ব্যবস্থাপনা অব্যাহত, অর্পিত সম্পত্তি রেকর্ডকরণ, তালিকাভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ড, জরিপকালে অবমুক্তির আবেদন বিবেচনা, আম-মোক্তারনামা বলে অবমুক্তি, বাৎসরিক লীজ মালিকানার হার ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৪ চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিনিময় সম্পত্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, অর্পিত বিনিময় নিয়মিতকরণ, বাজেয়াপ্ত জমির বিনিময় নিয়মিতকরণ, নিরীক্ষা বিষয়বস্তু ও নিয়মিতকরণ সত্যায়ন, উচ্ছেদ নিষিদ্ধ, রিভিউ, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৫ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিনিময় কেইস দ্রুত নিস্পত্তিকরণ, এস, এ খতিয়ান, খতিয়ান সংশোধন উত্তরাধিকারসূত্রে নামজারি, হস্তান্তর মূলে নামজারি, হস্তান্তর নোটিশ পাওয়া সত্বেও নামজারি করার কারণ, হস্তান্তর নোটিশ প্রাপ্তির পর নামজারি কেইসে সতর্কতা, জরিপ চলাকালে নামজারি, সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক খতিয়ান সৃজন, আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে নামজারি, খাসজমির ক্ষেত্রে ডিক্রি লাভ ও নামজারীর আবেদন, খাস জমিতে প্রজাস্বত্ব, আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে নামজারি, খাসজমির জন্য কালেক্টরের অনুমোদন, সমবায় সমিতির জমির ক্ষেত্রে নামজারি, অকৃষকের নিকট কৃষি জমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, সমবায় সমিতির নামজারির আবেদন পরীক্ষা, সমবায় সমিতির সদস্যগণের নামে নামজারি, জমা বিভক্তি,

রেজিষ্টার সংশোধন, নথির শ্রেণী বিভাগ, নামজারি ইত্যাদি, বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৬ ষোড়শ পরিচ্ছেদে নদীর তলদেশ ও মহীসোপান (ফোর শোর) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ, তলদেশ, ফোরশোর, নদীর তীর, তীরবর্তী ভূমি মালিকের অধিকার, বালি বা নুড়ী পাথর অপসারণ নিষিদ্ধ, তলদেশ বা ফোরশোর নির্মাণের অনুমতি, লাইসেন্স ফিস ও ব্যবস্থাপনা, ফিসের হিসাব, সফররত অফিসারের দায়িত্ব, অনধিকার বা প্রতিবন্ধকতার জন্য কার্যক্রম পদ্ধতি, অধিগ্রহণ ভূমিতে সরকারের অধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৭ সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রেজিষ্টার ও রিটার্নসমূহ, অর্থাৎ রেজিষ্টার-১, রেজিষ্টার-২, রেজিষ্টার-৩, রেজিষ্টার-৪, রেজিষ্টার-৫, রেজিষ্টার-৬, রেজিষ্টার-৭, রেজিষ্টার-৮, পরিদর্শন, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও পরবর্তী কার্যক্রম, সিকস্তী ও পয়স্তী জমি পরিদর্শন, রেজিষ্টার-৯, রেজিষ্টার-১০, রেজিষ্টার-১১, রেজিষ্টার-১২, রেজিষ্টার-১৩, রেজিষ্টার-১৪, রেজিষ্টার-১৭, রেজিষ্টার-২৬, রেজিষ্টার-৩২, রেজিষ্টার-৭১, রেজিষ্টার-৯৪, ১নং রিটার্ন, ২নং রিটার্ন, ৩নং রিটার্ন, সার্টিফিকেট দায়ের, মৌজার ম্যাপ সংরক্ষণ, ভেন্ডাইক ম্যাপ, ৪ইঞ্চি ম্যাপ, সীমানা চিহ্ন পরিদর্শন, গার্ড ফাইল, গ্রাম তথ্য বই (Village Note Book), সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে থানা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের জামানতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১১.১৯ উনবিংশ পরিচ্ছেদে হিসেব সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে সকল আদায়ের রশিদ প্রদান, পরিশোধ পদ্ধতি, রেজিষ্টারে আদায় অন্তর্ভুক্তকরণ, রশিদ প্রদান সংক্রান্ত নোটিশ, মনি অর্ডার প্রাপ্য অর্থের রশিদ, বকেয়া দাবীর উপর সুদ নির্ণয়, সার্টিফিকেট সুদ মওকুফ, হিসাবের নির্ভূলতা, প্রত্যেক পরিশোধের জন্য পৃথক রশিদ, ট্রেজারীতে দাবি পরিশোধ ও পাশবই, সার্টিফিকেট অফিস কর্তৃক আদায়, সার্টিফিকেট দাবি, ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট পরিশোধ, ভূমি সহকারী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান, ট্রেজারীতে জমা প্রদান ও পাশবই ভূমি সহকারী কর্তৃক নগদ প্রদান, সংস্থাপন ও আনুষংগিক খাতে ব্যয় বিল, রেজিষ্টার নিরীক্ষা, কতিপয় ক্ষেত্রে বিকল্প রশিদ, মওকুফ বা আদায় স্থগিত, তসরুফের ক্ষেত্রে করণীয় কাজ, কর্মকর্তার দায়িত্ব, কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট, অফিসারদের বেতন ও ভাতা, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংশোধনী প্রস্তাব, উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ বিতরণ, উপযোজন নিষিদ্ধ, পূর্তখাতের প্রশাসনিক অনুমোদন, উদ্বৃত্ত প্রতিবেদন, উদ্বৃত্তের ব্যাখ্যা, অগ্রিম উত্তোলন, উন্নয়ন কাজ বাজেটভূক্তির পর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা, কালেক্টর কর্তৃক পূর্ত কাজ সম্পাদন, স্থান নির্বাচন কমিটি, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কূপ খনন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২০ বিংশ পরিচ্ছেদে পরিদর্শন ও তদারকি, পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত অফিস পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পরিদর্শন, রেভিনিউ -

রেজিষ্টার সংশোধন, নথির শ্রেণী বিভাগ, নামজারি ইত্যাদি, বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৬ ষোড়শ পরিচ্ছেদে নদীর তলদেশ ও মহীসোপান (ফোর শোর) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ, তলদেশ, ফোরশোর, নদীর তীর, তীরবর্তী ভূমি মালিকের অধিকার, বালি বা নুড়ী পাথর অপসারণ নিষিদ্ধ, তলদেশ বা ফোরশোর নির্মাণের অনুমতি, লাইসেন্স ফিস ও ব্যবস্থাপনা, ফিসের হিসাব, সফররত অফিসারের দায়িত্ব, অনধিকার বা প্রতিবন্ধকতার জন্য কার্যক্রম পদ্ধতি, অধিগ্রহণ ভূমিতে সরকারের অধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৭ সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রেজিষ্টার ও রিটার্নসমূহ, অর্থাৎ রেজিষ্টার-১, রেজিষ্টার-২, রেজিষ্টার-৩, রেজিষ্টার-৪, রেজিষ্টার-৫, রেজিষ্টার-৬, রেজিষ্টার-৭, রেজিষ্টার-৮, পরিদর্শন, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও পরবর্তী কার্যক্রম, সিকস্তী ও পয়স্তী জমি পরিদর্শন, রেজিষ্টার-৯, রেজিষ্টার-১০, রেজিষ্টার-১১, রেজিষ্টার-১২, রেজিষ্টার-১৩, রেজিষ্টার-১৪, রেজিষ্টার-১৭, রেজিষ্টার-২৬, রেজিষ্টার-৩২, রেজিষ্টার-৭১, রেজিষ্টার-৯৪, ১নং রিটার্ন, ২নং রিটার্ন, ৩নং রিটার্ন, সার্টিফিকেট দায়ের, মৌজার ম্যাপ সংরক্ষণ, ভেন্ডাইক ম্যাপ, ৪ইঞ্চি ম্যাপ, সীমানা চিহ্ন পরিদর্শন, গার্ড ফাইল, গ্রাম তথ্য বই (Village Note Book), সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে থানা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের জামানতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১১.১৯ উনবিংশ পরিচ্ছেদে হিসেব সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে সকল আদায়ের রশিদ প্রদান, পরিশোধ পদ্ধতি, রেজিষ্টারে আদায় অন্তর্ভুক্তকরণ, রশিদ প্রদান সংক্রান্ত নোটিশ, মনি অর্ডার প্রাপ্য অর্থের রশিদ, বকেয়া দাবীর উপর সুদ নির্ণয়, সার্টিফিকেট সুদ মওকুফ, হিসাবের নির্ভূলতা, প্রত্যেক পরিশোধের জন্য পৃথক রশিদ, ট্রেজারীতে দাবি পরিশোধ ও পাশবই, সার্টিফিকেট অফিস কর্তৃক আদায়, সার্টিফিকেট দাবি, ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট পরিশোধ, ভূমি সহকারী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান, ট্রেজারীতে জমা প্রদান ও পাশবই ভূমি সহকারী কর্তৃক নগদ প্রদান, সংস্থাপন ও আনুষংগিক খাতে ব্যয় বিল, রেজিষ্টার নিরীক্ষা, কতিপয় ক্ষেত্রে বিকল্প রশিদ, মওকুফ বা আদায় স্থগিত, তসরুফের ক্ষেত্রে করণীয় কাজ, কর্মকর্তার দায়িত্ব, কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট, অফিসারদের বেতন ও ভাতা, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংশোধনী প্রস্তাব, উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ বিতরণ, উপযোজন নিষিদ্ধ, পূর্তখাতের প্রশাসনিক অনুমোদন, উদ্বৃত্ত প্রতিবেদন, উদ্বৃত্তের ব্যাখ্যা, অগ্রিম উত্তোলন, উন্নয়ন কাজ বাজেটভূক্তির পর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা, কালেক্টর কর্তৃক পূর্ত কাজ সম্পাদন, স্থান নির্বাচন কমিটি, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কূপ খনন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২০ বিংশ পরিচ্ছেদে পরিদর্শন ও তদারকি, পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত অফিস পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পরিদর্শন, রেভিনিউ -

ডেপুটি কালেক্টরের পরিদর্শন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (ভূমি সংস্কার) পরিদর্শন, পরিদর্শন নোট, আকস্মিক পরিদর্শন, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর রশিদ বই তলব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২১ একবিংশ পরিচ্ছেদে উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন প্রশ্নাবলী, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের গুরুত্ব, সার্টিফিকেট কেইস, কর আরোপ ও আদায় নামজারি, হাটবাজার, জরিপ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন প্রশ্নমালা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২২ উপর্যুক্ত মৌলিক আইনসমূহ ছাড়া এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইন সময়ের বিবর্তন ধারায় প্রণীত হয়েছেঃ

১। ১৮৫৯ সনের বেংগল ল্যান্ড এ্যাক্ট;
২। ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি এ্যাক্ট;
৩। ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট;
৪। ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন;
৫। ১৮৮৫ সনের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন;
৬। ১৮৯৪ সনের ফেরী আইন;
৭। ১৮৯৭ সনের ভূমি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট;
৮। ১৮৯৭ সনের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট;
৯। ১৯১০ সনের পি ডি আর এ্যাক্ট;
১০। ১৯৩৫ সনের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট এ্যাক্ট;
১১। ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন;
১২। ১৯৫১ সনের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন;
১৩। ১৯৬২ সনের ওয়াক্‌ফ আইন এবং ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ;
১৪। ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯২/৭২, ৯৮/৭২;
১৫। ১৯৭৪ সনের অর্পিত অনিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন;
১৬। ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ;
১৭। ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর বিধিমালা;
১৮। ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভূমি হুকুম দখল অধ্যাদেশ;
১৯। ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ;
২০। ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার বিধিমালা;
২১। ১৯৮৭ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ;
২২। ১৯৮৯ সনের ঋণসালিসী আইন;
২৩। ১৯৮৯ সনের বাংলাদেশ ঋণসালিসী বিধিমালা;
২৪। ১৯৮৯ সনের সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন;
২৫। ১৯৮৯সনের সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ বিধিমালা;
২৬। ১৯৮৯ সনের ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ;
২৭। ১৯৮৯ সনের ভূমি আপীল বোর্ড আইন;

২৮। ১৯৯১ সনের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ অধ্যাদেশ;

২৯। ১৯৯৪ সনে সিকস্তি, পয়স্তি আইনের সংশোধনের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

১২.০ উপসংহার

উপরের আলোচনায় সংক্ষেপে এদেশের ভূমি আইন সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইনের মৌলিক দিকসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা চালানো হয়েছে। দেশে যেকোন বিষয়ে বা পরিধিতে আইনের প্রণয়ন এত বেশী সংখ্যায় ও ব্যাপক কলেবরে হয়েছে যে, আইন প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে শুধু বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, রসিক পাঠককূলকেও বেরসিক হয়ে পড়তে হয়। এক রসিক পাঠক তাই মন্তব্য করেই ফেলেছিলেন- "আকাশে আছে যত তারা এদেশে আইনগুলোর তারও বেশী ধারা"।

এজন্য তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবেনা। সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে, সর্বোপরি দাযিত্বশীল সুশীল সেবক হিসেবে আমাদেরকে ভূমি আইনগুলো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে যুগোপযোগী, সহজ ও কল্যাণমুখী আইন প্রণয়নের জন্য নিতে হবে উদ্যোগী ভূমিকা।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। উমর, বদরুদ্দিন, ১৯৭৪ *চীরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, সুবর্ণ প্রকাশনা, ২৮ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১, মডার্ন টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, ঢাকা-১,

২। মিয়া, আব্দুল কাদের, ১৯৮৯ *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা-কাশবন মুদ্রায়ন,

৩। ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), (১৯৯৩) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭৭৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ - ঢাকাঃ এশিয়ান্টিক প্রেস, ১৯৯৩।

৪। মিয়া, আব্দুল কাদের, *ম্যানুয়েল*, ঢাকা-কাশবন মুদ্রায়ন,

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৩ *ভূমি সংস্কার কমিটিটি প্রতিবেদন*, ঢাকাঃ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

৬। ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, ১৯৮৭ *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল* ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রানালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-

৭। ভূমি মন্ত্রণালয়, *ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল-১৯৯০*, ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১৯৯০।

৮। মামুন, মুনতাশির (সম্পাদিত)ঃ *চীরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংগালী সমাজ*।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল

মোঃ হাসিবুর রহমান*

১.০ ভূমিকা

১.১ সম্রাট অশোকের আমলে আবাদকৃত জমির ফসলের এক দশমাংশ, শেরশাহের আমলে এক চতুর্থাংশ এবং আকবরের আমলে এক তৃতীয়াংশ দিয়ে রাজা-বাদশাহদের নিকট থেকে চাষ করার জন্য জমি পাওয়া যেত। আলতামাখা, মাদাদমাশ, জায়গীর ইত্যাদি হিসেবেও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি লাখেরাজ জমি ভোগ করতেন, কিন্তু আজকের দিনের মত জমির মালিকানা, রেজিস্ট্রী করে বিক্রী, দান, হেবা, বন্ধক ইত্যাদি হস্তান্তর বা প্রক্রিয়া সে যুগে ছিল না। শিবাজীর মত মারাঠা অধিপতিও দিল্লীর সম্রাটকে কর দেবার বিনিময়ে কৃষকদের কাছ থেকে ফসলের এক চতুর্থাংশ জোর কর আদায় করত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে শিবাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো দিল্লীর সম্রাটকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দেবার বিনিময়ে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার মাধ্যমে। ১৭৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর ইংরেজগণ দেখলেন এদেশের মানুষ বেঁচে না থাকলে খাজনাও পাওয়া যাবে না। সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে বিভিন্ন মেয়াদী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হলো, বেতনভোগী দেওয়ান ও নায়েব-নাজিমদের বদলে। জমিদারদের স্বেচ্ছাচার বন্ধের জন্য ১৮৬৯ সালে এলো রেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮৫ সালে বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ১৯৫০ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন। প্রজারাই জমির মালিক হলো। জমির প্রতি প্রজাদের মায়া সৃষ্টি হলো। ১২ বছর ভোগ দখলে থাক্‌লে জমির মালিক হওয়া যেত বিটি এ্যাক্টে। তখন থেকে জমি থেকে মালিকদের উচ্ছেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ভিটেমাটির মায়া কেউ ছাড়তে নারাজ এবং জমি থেকে কাউকে উচ্ছেদ করাও কঠিন কাজ। সুতরাং সংস্থা, অফিস ও উৎপাদনের জন্য সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের প্রয়োজন দেখা দিল।

১.২ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অনেক সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণের জমির অভাবে সম্ভব হয় না, সেজন্য জমি সম্পর্কে আগে থেকেই চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। জমির মালিকেরা বাধ্য না হলে জমি বিক্রয় করে না; কারণ প্রকল্পের জন্য অনেক সময় ২/৩ মাইল পর্যন্ত জমি প্রয়োজন হয়। এ জমির মধ্যে অনেক সময় মানুষের বাড়ীঘর, বড় বড় ফলের বাগান, গাছ, মসজিদ, গোরস্থান, শ্মশান, মাদ্রাসা, এতিমখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থাকে। অতএব আইনের আওতায় সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে জমি স্থায়িভাবে অধিগ্রহণ ও অস্থায়িভাবে হুকুম দখল করতে হয়।

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৩৪ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৯, চৈত্র ১৪০৫

২.০ সংজ্ঞা ও বিভিন্ন আইন ঃ

২.১ ভূমি অধিগ্রহণ বা Land Acquisition একটি চিরস্থায়ী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে জমির মালিক এবং ভূমি মন্ত্রণালয় জমি আর ফেরৎ পায় না। হুকুম দখলকে বলা হয় Requisition বা অস্থায়ী দখল। এটা বড় জোর দু বছরের জন্য করা যায়। ১৯৮৮ সালের ২৬ নং আইনের বলে হুকুম দখল করা যায় শুধু অস্থাবর বা Movable Property, কিন্তু ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল দুটির জন্যই প্রযোজ্য। অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যদেশ ১৯৮২ বা ১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তির সব কিছুই হুকুম দখল করা যায় না, যেমন স্থলযান ও জলযান। হুকুম দখল ছেড়ে দেয়ার ১৫ দিনের ভেতর জলযান ও স্থলযানের স্বাভাবিক ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। ব্যবহারের জন্য অন্যভাবে ক্ষতি হলে এবং সে ক্ষতি কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত হলে জলযান বা স্থলযানের মূল্যের ৬% ক্ষতিপূরণ অবচয় বাদ দিয়ে দেয়া হয়। স্থায়ী অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

২.২ ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে সম্পূর্ণ টাকা না দিলে জমির দখল ছাড়া হয় না, যা ঐ আইনের ১২ ধারায় বিবৃত ছিল। ১৯৪৮ সালের জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান আইনের মত গাছ ও ঘরের ক্ষতিপূরণ ১০০%ই দেয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০% বাকি থাকত। জেলা প্রশাসক বাকী ১০% দিয়ে পূর্ণ দখল গ্রহণ করতেন। পরে একই বিষয়ে আগের ১৯৪৮ এবং ১৯৮২ সালের আইনের সমন্বয়–এ ১৯৮৯ সালের ৯নং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে (সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন ১৯৮৯) ১৯৪৮ সালের আইন ও ১৮৯৪ সালের একই বিষয়ে আইন বাতিল হয়েছে। যদি পুরোনো মামলা (ঐ সময়কার) অনিষ্পন্ন থাকে তবে ১৯৪৮ সালের আইনে সিভিল কোর্ট বা দেওয়ানী আদালতে তা নিষ্পন্ন হবে। একই বিষয়ে KDA (খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), CDA (চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) RDA (রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ও DIT (ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা বর্তমানের রাজউক বা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এর জন্য ১৯৫৩ সনের ভূমি অধিগ্রহণের আইন প্রণীত হয়েছিল।

২.৩ বর্তমান ১৯৫৩, ১৯৮২ এবং ১৯৮৯ সালের আইনে চালু মামলাগুলোর জন্য (বর্তমানকালে উদ্ভূত) বলবৎ আছে। বর্তমানে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ ও ১৮৯৪ সালের (১নং আইন) আইন অকার্যকর। কর্তৃপক্ষ ১৯৪৮ সালের আইনে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জরুরিভাবে ঘরবাড়ি অফিস আদালত স্থাপনের জন্য (তৎকালীন পাকিস্তানের নুতন অফিস না থাকায়) অধিগ্রহণ করতে পারতো। ১৯৮৮ সালে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জরুরী সম্পত্তি হুকুম দখল আইন প্রণয়ন করা হলো। হুকুম দখল ছাড়ার ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। ১৯৮৮ সালের আইনে বর্তমানে তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা।

২.৪ ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৪ সালের আইনের দ্বারা রেলওয়ের জন্য জমি হুকুম দখল করে। কেও না চাইলে ভিআইপি ভিজিটের সময় পুলিশের জন্য হুকুম দখল করার জন্য যানবাহনের ভাড়া বাস্তবে দেয়া হয় না। বর্তমানের আইন অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল

২.০ সংজ্ঞা ও বিভিন্ন আইন ঃ

২.১ ভূমি অধিগ্রহণ বা Land Acquisition একটি চিরস্থায়ী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে জমির মালিক এবং ভূমি মন্ত্রণালয় জমি আর ফেরৎ পায় না। হুকুম দখলকে বলা হয় Requisition বা অস্থায়ী দখল। এটা বড় জোর দু বছরের জন্য করা যায়। ১৯৮৮ সালের ২৬ নং আইনের বলে হুকুম দখল করা যায় শুধু অস্থাবর বা Movable Property, কিন্তু ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল দুটির জন্যই প্রযোজ্য। অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যদেশ ১৯৮২ বা ১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তির সব কিছুই হুকুম দখল করা যায় না, যেমন স্থলযান ও জলযান। হুকুম দখল ছেড়ে দেয়ার ১৫ দিনের ভেতর জলযান ও স্থলযানের স্বাভাবিক ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। ব্যবহারের জন্য অন্যভাবে ক্ষতি হলে এবং সে ক্ষতি কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত হলে জলযান বা স্থলযানের মূল্যের ৬% ক্ষতিপূরণ অবচয় বাদ দিয়ে দেয়া হয়। স্থায়ী অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

২.২ ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে সম্পূর্ণ টাকা না দিলে জমির দখল ছাড়া হয় না, যা ঐ আইনের ১২ ধারায় বিবৃত ছিল। ১৯৪৮ সালের জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান আইনের মত গাছ ও ঘরের ক্ষতিপূরণ ১০০%ই দেয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০% বাকি থাকত। জেলা প্রশাসক বাকী ১০% দিয়ে পূর্ণ দখল গ্রহণ করতেন। পরে একই বিষয়ে আগের ১৯৪৮ এবং ১৯৮২ সালের আইনের সমন্বয়–এ ১৯৮৯ সালের ৯নং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে (সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন ১৯৮৯) ১৯৪৮ সালের আইন ও ১৮৯৪ সালের একই বিষয়ে আইন বাতিল হয়েছে। যদি পুরোনো মামলা (ঐ সময়কার) অনিষ্পন্ন থাকে তবে ১৯৪৮ সালের আইনে সিভিল কোর্ট বা দেওয়ানী আদালতে তা নিষ্পন্ন হবে। একই বিষয়ে KDA (খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), CDA (চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) RDA (রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ও DIT (ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা বর্তমানের রাজউক বা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এর জন্য ১৯৫৩ সনের ভূমি অধিগ্রহণের আইন প্রণীত হয়েছিল।

২.৩ বর্তমান ১৯৫৩, ১৯৮২ এবং ১৯৮৯ সালের আইনে চালু মামলাগুলোর জন্য (বর্তমানকালে উদ্ভুত) বলবৎ আছে। বর্তমানে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ ও ১৮৯৪ সালের (১নং আইন) আইন অকার্যকর। কর্তৃপক্ষ ১৯৪৮ সালের আইনে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জরুরিভাবে ঘরবাড়ি অফিস আদালত স্থাপনের জন্য (তৎকালীন পাকিস্তানের নুতন অফিস না থাকায়) অধিগ্রহণ করতে পারতো। ১৯৮৮ সালে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জরুরী সম্পত্তি হুকুম দখল আইন প্রণয়ন করা হলো। হুকুম দখল ছাড়ার ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। ১৯৮৮ সালের আইনে বর্তমানে তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা।

২.৪ ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৪ সালের আইনের দ্বারা রেলওয়ের জন্য জমি হুকুম দখল করে। কেও না চাইলে ভিআইপি ভিজিটের সময় পুলিশের জন্য হুকুম দখল করার জন্য যানবাহনের ভাড়া বাস্তবে দেয়া হয় না। বর্তমানের আইন অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল

আইন ১৯৮৮ এর ২৬ নং আইনের বলে ২ বৎসরের বেশী সময়ের জন্য কোন জলযান বা স্থলযান হুকুম দখল করা যায় না এবং স্থাবর সম্পত্তি (Immovable) হুকুম দখল করা যায় না, অধিগ্রহণ করা গেলেও। এখন অফিস, আদালত তৈরি হওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের প্রয়োজনও নাই। তবে বাস্তবে বন্যা প্রভৃতি দুর্যোগে হুকুম দখল করা হয়।

৩.০ প্রশাসনিক দিক ঃ

৩.১ ডেপুটি কমিশনার বলতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত তার অধীনস্থসহ অন্য কোন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হবেন। ভূমি হুকুম দখল সরকারের নির্দেশে বা অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে ডেপুটি কমিশনারই করবেন। ক্ষতিপূরণের মামলা আপীলের জন্য মালিকের আপত্তি থাকলে কমিশনারের নিকট আপীল বা আবেদন করতে হবে। সাব জজের নিচে নয় এমন দেওয়ানী মামলার জজকে আরবিট্রেটর নিয়োগ করা হবে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে জমির মালিকদের দাবি বিবেচনা করার জন্য। তাঁদের রায় অনেক সময় ২০ হাজার টাকার স্থলে ১ লাখ ২০ হাজার টাকাও হয়ে যায় এবং আদালতের রায়ের মতই বিবেচনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কমিশনার পর্যন্ত রায় আদালতের এখতিয়ার নয় এবং আরবিট্রেশনের রায় ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের মত কার্যকারিতা পেলে তা ও বিচারিক কার্যক্রম নয়; কারণ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বিচারে আপীল চলে না।

৩.২ জেলা প্রশাসক বর্তমানে ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন কেন্দ্রীয় কমিটি বা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই। ভবিষ্যতে ৫০ বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। বর্তমানে ১০ বিঘার উর্ধ্বে গেলে কমিশনারও কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন লাগে। ৫০ বিঘা পর্যন্ত জমি জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তে অধিগ্রহণ করার বিষয়টিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বা প্রাক্তন ওয়াপদার কাজের যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে জন্যই জেলা প্রশাসকের ভূমি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে উঠেছে। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুলের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টিতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ১৮৯৪,১৯৪৮ ও ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের সমন্বয়েই ১৯৮৯ সালের ৯নং আইন (সম্পত্তি জরুরি অধিগ্রহণ আইন) বলবৎ ছিল, মাত্র ৫ বছরের জন্য ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৮৯ সালের আইনের সমন্বয়েই বর্তমানে ১৯৮৯ সালের সম্পত্তি জরুরি অধিগ্রহণ আইন গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৪৮ এবং ১৮৯৪ সালের (১নং আইন) আইন বর্তমানে উদ্ভূত মামলার জন্য বাতিল হয়েছে। এটাই ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি হুকুম দখলের আইনগত দিক। প্রশাসনিক দিক হচ্ছে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, কমিশনার, সাব জজ, আরবিট্রেটরদের ক্ষমতাগত দিক। তবে আইন ও পদ্ধতির বাইরে ভূমি হুকুম দখল, অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, ভাড়া প্রদান ও মূল্য প্রদান করলে তার জন্য জবাবদিহিতাও আছে।

৪.০ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দিকসমূহ ঃ

৪.১ আরবিট্রেশনে আপত্তি জানালে এবং সময়মত ক্ষতিপূরণ না দিলে প্রতি বৎসর ১০% হারে বেশী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জেলা ক্ষতি পূরণ নির্ধারণ কমিটির ক্ষতিপূরণ আরবিট্রেশনেও বর্তমানে বৃদ্ধি করার একটা উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। এর ওপরে বাড়ানো যায় না।

৪.২ ঢাকা শহরের আশে পাশে ২৫ মাইল পর্যন্ত এলাকার ভেতর জমি অধিগ্রহণ করতে হলে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন লাগে। ভূমি মন্ত্রণালয়ে ঐ কমিটি বিরাজমান এবং ভূমি মন্ত্রী মহোদয় কমিটির চেয়ারম্যান। সড়ক ও জনপথ পরিদপ্তর, স্বাস্থ্য বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, রেলওয়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পূর্ত, কৃষি মন্ত্রণালয়, বন বিভাগসহ মোট ৭টি মন্ত্রণালয়ের অফিসার এর সদস্য। গাছের দাম কত হবে, গাছের বেড় (পরিধি) নির্ণয় করে বন বিভাগ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন।

৪.৩ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি দেশের সকল জেলাতেই আছে। বেসরকারী সংস্থা বা প্রকল্পের মালিক জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে জমির দখল বুঝে নিবেন। সরকারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং জলযান ও স্থলযান হুকুম দখল হতে পারে। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে এবং বরাদ্দ কমিটি সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করে। জেলা প্রশাসককে এখন ১০ বিঘার ওপরে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে মন্ত্রণালয়ের ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে যেতে হয়। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে পুলিশের এস, পি, সিভিল সার্জন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, কোর এসট্যাবলিসমেন্ট হিসেবে কমিটিতে থাকেন।

৫.০ আইনের বিভিন্ন অংশ/ধারাসমূহ এবং কমিটির কাঠামো

৫.১ ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনের ৫টি অংশ আছে এবং এতে স্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞায় শুধু জমি নয়, জমির সাথে সংলগ্ন জমির ফসলও বুঝানো হয়েছে। তারও ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আছে। তাই ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারও কমিটিতে থাকার প্রশ্ন আছে।

৫.২ প্রথমে মালিক কে তা না জানার জন্য ৩ ধারার নোটিশ তহশিল অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, জেলা প্রশাসকের অফিস, সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিস, সাব রেজিষ্টার অফিস ও মৌজায় ঝুলিয়ে দিয়ে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রচার করা হয়। এ নোটিশ জারির ১৫ দিন পর গণস্বার্থে উক্ত জমি হুকুম দখল প্রয়োজন বা অধিগ্রহণ প্রয়োজন এ মর্মে মালিককে জেলা প্রশাসক ৬ ধারারনোটিশ দেবেন, এবং ১৫ দিনের মধ্যে কারো আপত্তি থাকলে জেলা প্রশাসক আপত্তির কারণ শুনবেন। নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে মালিককে আপত্তি জানাতে হবে। আপত্তি থাকলে ১০ বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণ করতেও কমিশনার এবং পরে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে, আপত্তি না থাকলে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণের সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে ঃ

১। নির্ধারিত ছকে প্রকল্প প্রস্তাব (এটা ১০ বিঘার ওপরের জমির জন্য আপত্তি না থাকলেও মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।)

২। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের (যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্প) প্রশাসনিক অনুমোদন।

৩। জমির ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার প্রত্যায়নপত্র।

৪। জমির নক্সা (নকসায় লাল কালিতে চিহ্নিত ঐ দাগের প্রয়োজনীয় জায়গা বা Alignment in red ink দেখাতে হবে)।

৫। লে-আউট প্ল্যান

৬। ভূমির তফসিল

ভূমির তফসিলে জমির স্বত্বলিপি বা দাগ ও খতিয়ান নং, মৌজা, থানা, জমির মালিকের নাম, পিতার নাম ইত্যাদি থাকে। জমি যাতে অপচয় না হয়, সে জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার হিসেবে দেখাতে হয়। (লে-আউট প্ল্যানে জমির কোথায় কি বসানো হবে তা দেখানো হয় এবং কি জন্য কতটুকু জমি লাগবে তাও দেখানো হয়)।

ডিএলএসি হচ্ছে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা District land Acquisition Committee.

প্রতি জেলায় অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ কমিটি আছে। কমিটি নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিতঃ

ক) জেলা প্রশাসক, (কমিটির সভাপতি)

খ) জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট

গ) জেলায় কর্মরত গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী

ঘ) সিভিল সার্জন

জেলা প্রশাসক বাদে বাকী তিন জনকে জেলার Core Establishment হিসেবে সব কমিটিতেই থাকতে হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সদস্য সচিব।

এছাড়া কমিটিতে থাকেন উপ-পরিচালক কৃষি, থানা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জমির) এল, এ, ও বা Land Acquisition Officer, পৌর সভার চেয়ারম্যান, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যেমন কেডিএ, আরডিএ ও সিডিএ (সংশ্লিষ্ট জেলার) প্রতিনিধি। ১৯৮৮ সালের ২৬ নং আইনে স্কুল, এতিমখানা, দালান-কোঠা, বসবাস করার বাড়ী, হুকুম দখল করা যাবে না। শুধু অস্থাবর সম্পত্তি বা Movable Property বা জলযান ও স্থলযান ক্ষতিপুরণ ও ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে হুকুম দখল করা যাবে।

৫.৪ ১৯৪৮ সালের আইনে (হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি ঘর) ঢাকা শহরে অনেক বাড়ি-ঘর হুকুম দখলের অধীনে এখনো আছে, জামালপুরেও আছে। ১৯৮২, ১৯৪৮ ও ১৮৯৪ সালের সমন্বয়ে ১৯৮৯ সালের সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন হয়েছে। ১৯৮২ সালের বিধি বিধান ১৯৮৯তেও টিকে আছে, ১৯৫৩ সালের বিধি বিধানও। কিন্তু ১৯৪৮ ও ১৮৯৪ সালের (১ নং আইন) বিধি বিধান বর্তমানে উদ্ভুত মামলায় প্রযোজ্য নয়।

৫.৫ জেলা জজ বা সমতুল্য ট্রাইবুনালের কাছে দেওয়ানী আদালতের আরবিট্রেটর এর বিরুদ্ধে আপীল করা যায় (ক্ষতিপূরণ কম হলে এবং সরকারের পক্ষে বেশি হলে)। কিন্তু নোটিশে আদালতের এখতিয়ার নেই লেখা থাকলে আদালতে আপীল করা যাবে না। তখন সমন জারী করা, সাক্ষ্য, দলিল উপস্থাপন করা, ইত্যাদি দেওয়ানী কার্যক্রম দেওয়ানী আদালত কর্তৃক গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ১৯৮২ সালের এতদসংক্রান্ত অধ্যাদেশে বলা আছে– ধারা ৪৪–অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমে বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালত মামলা ও দরখাস্ত গ্রহণ করতে ও কোন নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবেন না। বাস্তব ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে, জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে শাসনতান্ত্রিক সমর্থনে সাব জজ বা জেলা জজ, হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকেন। কিন্তু কমিশনার ও মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে আপত্তি উত্থাপন যে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম নয় তা আগেই বলা হয়েছে। আরবিট্রেশন ও আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের এখতিয়ারে নয়।

৫.৬ ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশে মোট ৪৮ টি ধারা আছে। ধারা–১এ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং ধারা–২এ বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা দেয়া আছে। এটি অধ্যাদেশের প্রথম অংশ। এতে মোট ৫টি অংশ আছে। দ্বিতীয় অংশে আছে মোট ২২টি ধারা। ধারাগুলো অধিগ্রহণ সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ জারী, আপত্তি গ্রহণ ও শুনানী, অনুমোদন, জমির মালিকানা প্রমাণ, অধিগ্রহণ ও দখল, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান, জমি হস্তান্তর ও অধিগ্রহণকৃত জমির ব্যবহার সম্পর্কিত।

ধারা–৩ ঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৩ ধারায় জমির সংশ্লিষ্ট অফিসকে– স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, এসি (ভূমি) কে নোটিশ প্রদান ও এডিসি (রাজস্বের) নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ বহুল প্রচারের জন্য বিধান রয়েছে। ধর্মীয় উপাসনালয়, করবস্থান, শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না।

ধারা–৪ ঃ সংশ্লিষ্ট অফিসের আপত্তি থাকলে তা সরকারের নিকট থেকে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনারের নিকট আবেদন এবং তার শুনানী ও মতামতসহ মন্ত্রণালয় বা সরকারের নিকট প্রস্তাব করতে হবে।

ধারা– ৫ ঃ জমির সীমা অনুযায়ী ভূমি দখল প্রস্তাব সরকার বা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন। ৫ (৭) ধারানুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দায়িত্ব পালন।

ধারা– ৬ ঃ ইতোমধ্যে স্থানটি সার্ভেয়ার, কানুনগো দিয়ে সার্ভে করার পরও তহসিল অফিস বা রেজিষ্ট্রী অফিস থেকে ভূমিটি কার তা জানার পর স্বার্থসম্পন্ন অংশীদারদের ওপর নোটিশ জারী মালিকানা প্রমাণের নির্দেশ ও জমি যে হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা হবে তার নোটিশ প্রদান।

ধারা – ৭ ঃ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, আপত্তি, শুনানী ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান, ক্ষতিপূরণ গ্রহণের নির্দেশ

(কোন আপত্তি না থাকলে আর বি বা রিকোয়ারিং বডি থেকে ক্ষতিপূরণ খরচ সমেত আদায়ের পর)।

ধারা-৮ ঃ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়াদি-৩ ধারা নোটিশ যে তারিখে জারী করা হয়েছে তার পূর্ব দিন থেকে পূর্ববর্তী এক বছরের ভেতর একই এলাকার সম গুণাগুণ সম্পন্ন জমি যা রেজিষ্ট্রী পূর্বক বিক্রয় করা হয়েছে (সাফ কওলা ব্যতীত অন্যান্য ধরনের হস্তান্তর নয়) তার বিক্রয় মূল্য সংগ্রহ করে গড় নিতে হবে। খুব উচ্চ মূল্য ও খুব নিম্ন মূল্য গড় হতে বাদ দিতে হবে।

উদাহরণ

মৌজা সাধাপুর (কাল্পনিক)

দলিল নং	দলিলের তারিখ	মোট বিক্রীত জমির পরিমাণ	(একর প্রতি)	মোট মূল্য টাকা
৩১৭৩৬	২৫-১২-৮৫	৮ শতাংশ	২০,০০০/	=২,৫০,০০০/
২২,৩৩৪	০১-১-৮৫	২৮ শতাংশ	৫০,০০০/	=১,৭৮,৫৭১/
১৩৮৭৬	০৭-০৬-৮৫	৬৪ শতাংশ	১,৮০,০০০/	=২,৮১,২৫০/
৫১১২	০২-০২-৮৫	১০০ শতাংশ	২,৫০,০০০/	=২,৫০,০০০-

৫.৭ গড় একর প্রতি মূল্য দাঁড়ায় ২ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা। এর চাইতে বেশি হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে জবাবদিহি করতে হয় এবং কম হলেও আপত্তি উঠতে পারে। এই মূল্যের সঙ্গে বর্তমানে ৫০% বেশি যোগ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমির মালিকদের দাবি শোধ করা হয়। আগে ৫০% এর স্থলে মাত্র ২০% বেশি দেয়া হতো। ১ বছরের গড় মূল্য বর্তমানে বিবেচ্য বিষয়। আগে দেয়া হতো গড় মূল্যের চাইতে ২০% বেশি।

৫.৮ ১৯৮৯ সালের অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। জমি কেনা বেচায় কোন Value added বা মূল্য সংযোজন হয় না। কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে যেমন, বিএডিসি' র সার ও গভীর নলকূপ ও শ্যালো টিউব ওয়েলের ব্যবসায় ও পানি সেচের ব্যবসায়, নির্ভরশীলদের বিদেশে প্রেরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনেও মূল্য সংযোজন হয়ে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ হতে পারে, জমি বিক্রয়ের মাধ্যমে। ৯ নং ধারায় আছে, যে সমস্ত বিষয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য নয়, যেমন অধিগ্রহণকৃত জমির দখল ছেড়ে দেবার পর শতাধিক বছরের গ্রামের মায়া ছেড়ে অন্য গ্রামে জমি কিনে বসবাস করতে জমির মালিকেরা নারাজ; এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। গ্রামের মায়া উন্নয়ন ও বৃহত্তর জনস্বার্থে ছেড়ে দিতে হবে।

ধারা-১০ ঃ মালিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ না করলে তা ট্রেজারী বা সরকারী কোষাগারে জমা দিয়েই মনে করতে হবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। জেলার সোনালী ব্যাংকই বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্রাঞ্চ হিসেবে ট্রেজারীর দায়িত্ব পালন করে

এবং চালানের মাধ্যমে সরকারের হয়ে টাকা গ্রহণ করে মফঃস্বল শহরগুলোতে।

ধারা-১১ ঃ জমির দখলগ্রহণ ও অধিগ্রহণ সম্পর্কে গেজেট বিজ্ঞপ্তি। গেজেটে ১৯৮২ সালের এবং ময়মনসিংহে ১৯৮৭ সালের আইনের সূত্রে তফসিলসহ অধিগ্রহণের তথ্য প্রকাশিত হয়। কোনটি পূর্ণ দাগ, কোনটি আংশিক দাগ ও কয়েকটি খতিয়ান। ১৯৮৭ সাল থেকে ভূমি সংস্কার অভিযান শুরু হয়।

ধারা-১২ ঃ ৩ ধারা নোটিশ জারীর ১ বৎসরের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা জমির ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না করলে ভূমি দখল কেসটির কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাবে এবং এ মর্মে গেজেট বিজ্ঞপ্তি হবে। তবে এ কারণে জমির দাম তৃতীয় পক্ষ কম দিতে পারে, ভবিষ্যতে আবারও অধিগৃহীত হওয়ার ভয়ে। জমির মালিকের সুযোগ থাকলে এই একোয়ারের জন্য জমি ফেরৎ চেয়ে তার ভবিষ্যৎ মূল্য কমে যাওয়ার জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। 'নোটিশে নিষেধ থাকলে মামলা করা যাবে না' বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় নোটিশে লেখা থাকে।

ধারা-১৩ ঃ কোন বাড়ি ঘর, ইমারত বা তার অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ করা যাবে না। জেলা প্রশাসক কাগজ দেখে এবং ঐ সমস্তের অবস্থান দেখে সিদ্ধান্ত দেবেন ঐ গুলো অধিগ্রহণের এলাকায় পড়বে কিনা। অধিগ্রহণের আওতায় অল্প একটু অংশ পড়লেও মালিক সমস্ত বিল্ডিং এর দাম আদায় করতে পারে, আপত্তি করে বা দেওয়ানী মামলা করে, নোটিশে তা উল্লেখ না থাকলে। ঐ একটু ভেঙ্গে সমস্ত বাড়িটাই রক্ষা করে বাড়ির মালিক বিরাট লাভবান হতে পারেন। জেলা প্রশাসক বা এডিসি (রাজস্ব) দেখবেন এটা যেন না হয়, তা হলে তাদের জবাবদিহিত্ব বেড়ে যেতে পারে। জেলা গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা প্রশাসককে এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করবেন।

ধারা-১৪ ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন অধিগ্রহণের খরচ (আনুষঙ্গিক) ব্যক্তি তহবিল থেকেই মেটানোর জন্য আদায় করা হবে। তবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি থেকেই নামজারির ব্যবস্থা হবে। ১৯৪৮ সালের আইনে থাকলেও ১৯৮২ সালের আইনে জমি পুনঃরেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই। সরকারের জন্য অধিগ্রহণ করা হলে আনুষঙ্গিক খরচ গ্রহণ করা হয় না।

ধারা-১৫ ঃ ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তি করবেন, চুক্তি মোতাবেক জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণের পর ব্যক্তিকে (যিনি ব্যক্তিগত প্রকল্প গ্রহণ করবেন) জমি হস্তান্তর করবেন। জমির পূর্বের মালিকের সাথে তার কোন সম্পর্ক বা কথাও হবে না। সম্পূর্ণ টাকা চেক বা নগদে গ্রহণ করে চালানের মাধ্যমে এল, এ, হেডে ট্রেজারীতে

(সোনালী ব্যাংকে) জমা দেয়া হবে এবং মালিককে ৭ ধারার নোটিশের পর চেকের মাধ্যমে কাগজপত্র দেখে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে যা (সোনালী ব্যাংকে) জমাকৃত অর্থ থেকে পরিশোধিত হবে।

ধারা-১৬ ঃ ভুলক্রমে প্রদত্ত অর্থ সরকারী দাবি হিসেবে ভুল ব্যক্তি, বেশি গ্রহীতা থেকে আদায় করা হবে।

ধারা-১৭ ঃ এক উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার চলবে না। এ অবস্থায় প্রকল্প গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা ঐ জমি সরকারকে সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ) বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রয়োজন হয়। ঐ বিধিগুলোর কিছু নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

এই অধ্যাদেশের তৃতীয় অংশ ঃ সরকারী পয়োজনে বা গণস্বার্থে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে হুকুম দখল করা যাবে।

ধারা-১৮ ঃ যে কোন ভূমি দু' বছরের বেশি সময়ের জন্য হুকুম দখল করা হলে সরকার বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে। তবে মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান, এতিমখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুকুম দখল করা যাবে না। জলযান ও স্থলযানের ক্ষতি হলে অবচয় (Depreciation) বাদ দিয়ে ৬% (পুরাতন যানের ক্ষেত্রে) ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, ঐ যানের বর্তমান মূল্য কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে।

ধারা-১৯ঃ সরকার বা মন্ত্রণালয়ের হুকুম দখল আদেশ সংশোধন পরিবর্তন বা বাতিলের ক্ষমতা সরকারের থাকবে। এ বিধির বলেই নতুন বিধি প্রণীত হয়।

ধারা-২০ ঃ জেলা প্রশাসক সাময়িক হুকুম দখলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন।

ধারা-২১ ঃ মালিককে ক্ষতিপূরণ কোন কারণে দেওয়া সম্ভব না হলে তা সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

ধারা-২২ ঃ জেলা প্রশাসক যার জন্য হুকুম দখল করা হয়েছে তার নিকট থেকে (ব্যক্তি বা সংস্থা বা অন্য মন্ত্রণালয়) প্রচলিত ভাড়া আদায় করবেন। বাস্তবে এসপি ডিএসবিকে জলযান বা স্থল যান হুকুম দখলের নির্দেশ দিলে ডিএসবি জেলা প্রশাসক অফিসে তা দিলে জেলা প্রশাসক আরআইকে (রিজার্ভ ইনসপেক্টর অব লাইন পুলিশ) তা দেন, আর আই সার্জেন্ট এর মাধ্যমে জলযান বা স্থলযান হুকুম দখল করেন। সার্জেন্ট ও তার কনস্টেবলদেরকে জলযান ও স্থলযানের মালিকেরা খুব তাজিম করেন ও তাদের দ্বারা জারিকৃত হুকুম অমান্য করেন না।

ধারা-২৩ ঃ জেলা প্রশাসক দখলকৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষতিপূরণ, ভাড়া প্রদান ও মেরামতের জন্য দায়ী।বাস্তবে কেও না চাইলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না। ভয়ে কেউ চায়ও না। কারণ কোন্ সময় সার্জেন্ট কোন্ দোষ ধরে

আবার পুলিশ এ্যাক্টে ফেলে তাদের নাজেহাল করে। সার্জেন্ট দুই তিনজন কনষ্টেবলসহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণেই ট্রাফিক আইন কার্যকরী করেন। ট্রাফিক আইনে সার্জেন্টদের মামলা করতে হলে থানা উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

ধারা–২৪ ঃ হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির প্রয়োজন আর না থাকলে তা মালিকের নিকট বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ফেরৎ দিতে পারেন।

ধারা–২৫ ঃ অবৈধ দখলদারদের হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি থেকে উৎখাতের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্ব রয়েছে। সহজে সম্পত্তি হস্তান্তর না করলে পুলিশি হস্থক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ধারা–২৬ ঃ ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কোন সম্পত্তি হুকুম দখল করা যাবে না।

মীমাংসা ঃ– যদি আপত্তি ওঠেঃ

ধারা–২৭ ঃ জেলা প্রশাসক সাব জজ পর্যায়ের নীচে নন এমন একজন কর্মকর্তাকে মীমাংসক বা আরবিট্রেটর নিয়োগ করবেন বিজ্ঞপ্তি জ্যরির মাধ্যমে।

ধারা–২৮ ঃ জমি বা সম্পত্তির মালিক ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট না হলে নোটিশ জারির ৪৫ দিনের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে পারেন রোয়েদাদ সম্পর্কে। রোয়েদাদ হচ্ছে সম্পত্তির মালিকদের জমির হিস্সা মোতাবেক ক্ষতি পূরণের উল্লেখ থাকে যে তালিকাটিতে সেই তালিকাটি। এটা ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিয়ে রেজিষ্ট্রী করতে হয় না এবং বিভিন্ন ফি দিতে হয় না। মালিক আরবিট্রেটরের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে পারেন, রোয়েদাদ মালিকের নিকট সন্তোষজনক না হলে।

ধারা–২৯ ঃ শুনানী পদ্ধতি নোটিশ জারির মাধ্যমে হবে (আরবিট্রেটর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবিদারকে)।

ধারা–৩০ ঃ আপত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থের মধ্যে মামলার আওতা সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন ভিটেমাটির মায়া ছাড়া স্বার্থের আওতাভুক্ত নয়।

ধারা–৩১ ঃ মীমাংসক অধ্যাদেশের ৮/৯ ও ২০ ধারা মতে পরিচালিত হবেন।

ধারা–৩২ ঃ মীমাংসকের রোয়েদাদ একটি রায়। এটা লিখিত, স্বাক্ষরিত ও যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। যদিও মীমাংসকের কার্যক্রম বিচারিক কার্যক্রম নয় (আদালতে মামলা দায়ের করে)।

ধারা–৩৩ ঃ মামলার খরচ ও তার বন্টন রোয়েদাদে উল্লেখ করতে হবে।

ধারা–৩৪ ঃ বিজ্ঞপ্তির মাধমে (তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবিদারদের) রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল ট্রাইবুনাল জেলা জজ পদ মর্যাদার এক সদস্য বিশিষ্ট আরবিট্রেশন কমিটি সমন্বয়ে গঠন করতে হবে।

ধারা–৩৫ ঃ ১৯৪০ সালের আরব্রিট্রেশন আইন এখানে প্রযোজ্য হবে না। যে আইনে সময়মত ক্ষতিপুরণ না দিলে আরবিট্রেশনে আপত্তি জানালে

বাৎসরিক ১০% বেশি ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান আইনেই আরবিট্রেশন সম্পর্কে বলা আছে। যেখানে বলা নেই সেখানে ১৯৪০ সালের আরবিট্রেশন আইনে যাওয়া যাবে।

ধারা-৩৬ ঃ জেলা প্রশাসক ও মীমাংসককে ১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের দেওয়ানী কার্যবিধির কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। গেজেটের পর আর জমি রেজিষ্ট্রেশন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। গেজেট দেখেই নাম জারি করতে হবে।

ধারা-৩৭ ঃ সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে প্রবেশ, পরিদর্শন, জরিপ, সীমা নির্ধারণকরণ সম্পর্কে ক্ষমতা।

ধারা-৩৮ ঃ সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯ ঃ নোটিশ ও আদেশ কিভাবে জারি করা যাবে সে সম্পর্কে ক্ষমতা।

ধারা-৪০ ঃ আদেশ অমান্য ও কার্য সম্পাদনে বাধার জন্য ৬ মাস জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা ও উভয়বিধ শাস্তি।

ধারা-৪১ ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসককে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান।

ধারা-৪২ ঃ ক্ষতিপুরণের রোয়েদাদের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস মওকূফ ঃ জমি রেজিষ্ট্রেশনের সময় যত ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও ফিস লাগে তা লাগবে না।

ধারা-৪৩ ঃ অধ্যাদেশের আওতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করলে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা তদন্ত বা আইনগত কোন বিচার প্রযোজ্য হবে না (ইনডেমনিটি)।

ধারা-৪৪ ঃ এ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে বিশেষ অবস্থায় আদালতে মামলা গ্রাহ্য না হওয়া

ধারা-৪৫ ঃ সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ ,বন্টন।

ধারা-৪৬ ঃ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান।

ধারা-৪৭ ঃ অধুনালুপ্ত ১৯৪৮ সালের (জরুরী) সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের বিশেষ অনিষ্ট সম্পর্কিত। উক্ত আইনে কার্যক্রম শুরু হলে এখনো তা নিষ্পন্ন না হলে উক্ত আইনেই নিষ্পন্ন হবে।

ধারা-৪৮ ঃ অনুরূপভাবে ১৮৯৪ সালের ধারা বলে কোন মামলা শুরু হলে তা উক্ত আইনের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হবে। এই অধ্যাদেশ ১৮৯৭ সালের 'জেনারেল রুলস এ্যাক্ট' এর ব্যবস্থা মতে উক্ত আইন (১৮৯৪ সালের ১ নং আইন) রহিত ও লিপিবদ্ধ করতে পারবে, যখন যে টি প্রয়োজন হবে মামলা নিষ্পত্তির জন্য।

৬.০ উপসংহার

উন্নয়নের স্বার্থে জমির অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অপরিহার্য। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দুঃখকষ্ট যাতে লাঘব হয়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সেবার মনোভাব এ প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনকল্যাণমুখী করতে পারে।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তথ্যপঞ্জি ঃ

১। রহমান 'সৈয়দ লুৎফর,' (১৯৯১), সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল ম্যানুয়াল

২। বেগম 'আয়শা হক', (১৯৮৬), রাজশাহী ভূমি অধিগ্রহণ নির্দেশিকা

৩। শাহবাগস্থ বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমীতে অনুষ্ঠিত প্রথম উচ্চতর আইন ও প্রশাসন কোর্সে প্রদত্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব জগন্নাথ দে কর্তৃক প্রভাষণ।

৪। গাজীপুরের মৌচাক ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মিঃ উক্যজেন প্রদত্ত প্রভাষণ।

৫। মানিকগঞ্জ ও জামালপুরের জেলা প্রশাসক অফিস থেকে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সভার কর্মপত্র ও কার্যবিবরণী ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যকর মাধ্যম

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা*

১.০ ভূমিকা

১.১ সাধারণভাবে বলতে গেলে, সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে "to reach a decision on a shared problem." এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সভার উদ্যোক্তারা কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। এ প্রস্তুতির কিছু ভৌত (physical) ও কিছু দালিলিক (documentary) দিক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সভা-সম্মেলনের দুর্বলতম দিক হচ্ছে দালিলিক ব্যবস্থাপনা।

১.২ সভার দালিলিক প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হল ঃ

- ক. সভার আলোচ্যসূচি (Agenda of the meeting) নির্ধারণ;
- খ. সভার কর্মপত্র (Working Papers) প্রণয়ন; এবং
- গ. সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice of the meeting) জারি।

২.০ সভার বিজ্ঞপ্তি

২.১ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ-

- ক. সভা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা;
- খ. বিজ্ঞপ্তি-সংখ্যা ও জারির তারিখ;
- গ. বোর্ড/কমিটির নাম (যদি থাকে);
- ঘ. সভার ধারাবাহিক সংখ্যা (যদি থাকে);
- ঙ. সভার তারিখ (বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ), বার ও সময়;
- চ. সভার স্থান (পূর্ণ ঠিকানাসহ);
- ছ. সভাপতির নাম এবং প্রয়োজনবোধে সভায় কারা অংশগ্রহণ করবেন, সে সম্পর্কিত ধারণা;
- জ. সভার উদ্দেশ্য।

২.২ কোন কোন সংস্থায় বিশেষ বিশেষ কমিটির নিয়মিত সভার একটি নির্দিষ্ট তারিখ থাকে। কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতির পক্ষে এটি সুবিধাজনক। বোর্ড/ কমিটি, সভাশেষে পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিটি/সভার সভাপতি সভার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন। এরপর

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাধারণত কমিটির সদস্য–সচিবের স্বাক্ষরে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। অবশ্য সভাপতির স্বাক্ষরেও সভার বিজ্ঞপ্তি জারি হ'তে পারে। যে কোন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা/সিদ্ধান্তের জন্য সভা হতে পারে। সভা কোন্ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ সভাপতিত্ব কে করবেন তা এবং সভাপতি কর্তৃক দিনক্ষণ নির্ধারণের পর একজন উপযুক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তার স্বাক্ষরে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়া উচিত; মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে নথি প্রক্রিয়াকারী base level কর্মকর্তা (সহকারী সচিব) এর স্বাক্ষরে এটি জারি হতে পারে। সভার বিজ্ঞপ্তি এমনভাবে জারি করতে হবে, যাতে তা' যথাসময়ে সদস্যগণের নিকট পৌছে এবং তাঁরা সভায় অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারেন।

৩.০ সভার আলোচ্যসূচি

৩. ১ সভার আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত কম হলে তা' সাধারণত সভার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলোচ্য বিষয়ের তালিকা দীর্ঘ হলে পৃথক আলোচ্যসূচি তৈরি করে তা' সভার বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। আলোচ্যসূচিতে ধারাবাহিকভাবে সভার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়। এসব শিরোনাম সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বব্যাখ্যাত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে সদস্যগণ তাৎক্ষণিকভাবে সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারেন।

৪.০ কর্মপত্র কী?

৪.১ ব্যাপক অর্থে সভার বিজ্ঞপ্তি ও আলোচ্যসূচি কর্মপত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও মূল কর্মপত্র হচ্ছে আলোচ্য বিষয়/সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী, বিধিবিধান, যুক্তি ও প্রস্তাব সম্বলিত একটি বিবরণ, যার ভিত্তিতে সদস্যগণ সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সর্বাঙ্গসুন্দর কর্মপত্রে (যেখানে যেমন প্রযোজ্য) নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর উল্লেখ করতে হয়ঃ–

প্রাথমিক অংশ

ক. প্রতিষ্ঠানের নাম ও সভার ক্রমিক সংখ্যা (যদি থাকে);
খ. আলোচ্য বিষয়ের ক্রমিক সংখ্যা;
গ. আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম।

মূল অংশ

ক. আলোচ্য বিষয়/ সমস্যার পটভূমি (Background information);
খ. এতদ্সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান;
গ. গ্রহণীয় সিদ্ধান্তের বিষয় (Points for decision);
ঘ. এতদ্সংক্রান্ত প্রচলিত আইন–কানুন, বিধি–বিধান ও আদেশ–নির্দেশ;
ঙ. পূর্ব–দৃষ্টান্ত বা নজির (precedent)।

শেষাংশ

ক. বিকল্প কর্মপন্থা/প্রস্তাবসমূহ (Alternatives);
খ. প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তি;
গ. সুপারিশ/প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব।

৪.২ কর্মপত্রের একটি সহজ ফরম্যাট চিত্র ১–এ দেখা যেতে পারে।

চিত্র ১ ঃ কর্মপত্রের ফরম্যাট

(প্রতিষ্ঠানের নাম)

(ঠিকানা)

........বোর্ড/কমিটির ..... তম সভার কর্মপত্র (যদি নিয়মিত সভা হয়)

বিষয়–১ ঃ ....

১.১ (আলোচ্য বিষয়ের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য)

১.২ (সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ, যুক্তি/বিধি–বিধানের বরাত সহ)

১.৩ (প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত)

বিষয়–২ ঃ ....

২.১ (আলোচ্য বিষয়ের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য)

৩.২ (সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ, যুক্তি/বিধি–বিধানের বরাত সহ)

২.৩ (প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত)

....

(সদস্য–সচিবের স্বাক্ষর)

(নাম) ....

(পদবী) ....

দ্রষ্টব্য ঃ – এ কর্মপত্র প্রেরিত হবে আলাদা অগ্রায়নপত্রের মাধ্যমে।

–কর্মপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে পরিশিষ্ট সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৩ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই সভার কর্মপত্র সদস্যদের অবগতির জন্য বিতরণ করা হয়। সাধারণত সভাপতি কর্তৃক অনুমোদনের পর সদস্য–সচিব অথবা বিজ্ঞপ্তি–স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্মপত্রে স্বাক্ষর করেন। সভাপতি নিজেও কর্মপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন। কর্মপত্র যাতে যথাসময়ে সদস্যগণের নিকট পৌঁছে এবং তাঁরা আলোচ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে সভায় যোগদান করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.০ কর্মপত্র তৈরির উদ্দেশ্য

৫.১ সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সভার সদস্যগণ। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হল প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্য। কর্মপত্র সভার সদস্যগণকে এ তথ্য সরবরাহ করে। সুতরাং সভার কর্মপত্রের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- ক. আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ;
- খ. সভায় সকল সদস্যের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি;
- গ. আলোচনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে সভার সুষ্ঠু পরিচালনায় সহায়তা;
- ঘ. সভাস্থলে প্রশ্নের সংখ্যা হ্রাস তথা আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণ;
- ঙ. সভার সময় নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবান সময়ের সাশ্রয়;
- চ. সভার কার্যক্রমে তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ছ. সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ সম্পর্কে অবহিত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬.০ কর্মপত্র তৈরির প্রক্রিয়া

৬.১ সাধারণত সদস্য–সচিব অথবা নথিপ্রক্রিয়াকারী base level কর্মকর্তা কর্মপত্রের খসড়া তৈরি করে সভাপতির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। তবে কারো একার পক্ষে যথাযথ কর্মপত্র তৈরি করা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য অন্যান্য অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বোর্ড ইত্যাদির নির্ধারিত নিয়মিত সভার ক্ষেত্রে সাধারণত সভা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পূর্বেই বিভিন্ন বিভাগ/শাখা থেকে সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি ও কর্মপত্রের খসড়া চাওয়া হয়। সদস্য–সচিব সেগুলো সংকলন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করেন। কর্মপত্রে কোন বিশেষায়িত আলোচ্য বিষয়/সমস্যা থাকলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন কোন বিশেষ প্রসঙ্গে সভা আহ্বান করা হয় তখন সেই বিশেষ বিষয়ে base level কর্মকর্তা কর্মপত্র তৈরি করে সভাপতির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

৭.০ সার্থক কর্মপত্রের বৈশিষ্ট্য

৭.১ কর্মপত্র তৈরির সব চাইতে বড় উদ্দেশ্য হল সভায় অংশগ্রহণকারী সকলে যাতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে আলোচ্য বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ততা কী ও কতটুকু, যাতে তারা প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে এবং সভার সময় বিষয়টি সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান/মতামত সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারে। কাজেই কর্মপত্র তৈরির সময় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সদস্যদের আগ্রহ ও জ্ঞানের মাত্রা (level of knowlege) সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সভার সদস্যগণই হচ্ছেন কর্মপত্রের ব্যবহারকারী। ভাল কর্মপত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকে ঃ

ক. প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্যাদির সমাবেশ;
খ. সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য;
গ. যুক্তিগ্রাহ্য বিকল্পের উপস্থাপনা (যেখানে সম্ভব এবং প্রয়োজন);
ঘ. সুস্পষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ;
ঙ. সহজবোধ্য ও শুদ্ধ ভাষা।

৮.০ কর্মপত্রের ভাষা

৮.১ কর্মপত্রের ভাষা সহজবোধ্য ও শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

ক. যথাসম্ভব ছোট বাক্য ও প্রচলিত শব্দের ব্যবহার;
খ. বানান ও বাক্যের শুদ্ধতা;
গ. কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কর্তৃবাচ্য লিখতে ও বুঝতে সুবিধেজনক।

৯.০ দুর্বল কর্মপত্রের বৈশিষ্ট্য

৯.১ সর্বাঙ্গসুন্দর কর্মপত্র বাস্তবে বিরল। অনেক দপ্তরে অতি অল্প সময় দিয়ে সভা ডাকা হয় এবং সভার বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে কোন কর্মপত্র সংযোজন করা হয় না। ফলে সদস্যগণ সভার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারেন না। অনেক কর্মপত্রেই নিম্নলিখিত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়ঃ

ক. প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাব;
খ. তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি;
গ. অস্পষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য;
ঘ. বিকল্প কর্মপন্থা নির্দেশ না করা;
ঙ. দ্ব্যর্থ-বোধক প্রস্তাব/সুপারিশ;
চ. দীর্ঘ, জটিল, দুর্বোধ্য ও অশুদ্ধ বাক্য এবং শব্দের বানান ও গঠনগত ত্রুটি।

১০.০ কার্যবিবরণী কী?

১০.১ সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কার্যবিবরণী হচ্ছে সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবরণী (A written record of the business transacted in a meeting)। সভা ছাড়াও সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণী লেখা হয়। এজন্য কার্যবিবরণীর আকার ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দাপ্তরিক কাজে সচরাচর যেসব সভা হয়, তার কার্যবিবরণীকে minutes বলাই সমীচীন। এ ক্ষেত্রে আলোচিত বিষয়গুলো ও সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। সাধারণত ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য minutes এ উদ্ধৃত করা হয় না। অপরদিকে সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণীকে proceedings বলা হয়। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত বক্তব্য ও সুপারিশমালা proceedings -এ সন্নিবেশিত করা হয়। সংসদের কার্যবিবরণীকেও

proceedings নামে অভিহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সভার কর্মপত্র যেমন যথাসময়ে ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় না, তেমনি কার্যবিবরণীও সুলিখিত ও যথাসময়ে বিতরণ করা হয় না।

১১.০ কার্যবিবরণীর প্রয়োজনীয়তা

১১.১ সভার আলোচনাসমূহকে লিখিত তথা দালিলিক (documentary) রূপ প্রদানই কার্যবিবরণী লিখনের উদ্দেশ্য। প্রথমত, সভার সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত রূপ পেলে তার বাস্তবায়ন (follow up action) সুবিধেজনক হয়। দ্বিতীয়ত, কার্যবিবরণী লিখিত ও অনুমোদিত হলে কারো পক্ষে সিদ্ধান্তের বিষয় অস্বীকার করা সম্ভব হয়না। তৃতীয়ত, কার্যবিবরণী সংরক্ষণযোগ্য বিধায় পরবর্তীকালে তা' তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে।

১২.০ কার্যবিবরণী কে লিখবেন?

১২.১ সাধারণত সভা আয়োজনকারী base level কর্মকর্তা এবং বোর্ড, কমিটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সদস্য–সচিব কার্যবিবরণী লিখেন এবং তা সভাপতির স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিও কার্য্যবিবরণী লিখতে পারেন। সভায় বিভিন্নমুখী বিষয় আলোচিত হলে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশের খসড়া তৈরি করতে পারেন এবং সভা আয়োজনকারী base level কর্মকর্তা বা সদস্য–সচিব সেগুলো সংকলন করে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তবে, কার্যবিবরণী কে লিখবেন, তা সভা শুরু হওয়ার পূর্বেই নির্ধারিত হওয়া দরকার।

১৩.০ কার্যবিবরণী লেখকের গুণাবলী

১৩.১ একজন ভাল কার্যবিবরণী লেখকের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সমাহার থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

ক. সভার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা;

খ. আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা;

গ. সভার সদস্যদের নাম ও পদবী জানা। টেবিল–কার্ড এ কাজে সহায়ক হতে পারে;

ঘ. মনোযোগ ও সতর্কতা। বিলম্বে উপস্থিতি এবং আসন পরিবর্তনও তাঁকে লক্ষ্য করতে হবে;

ঙ. শ্রবণের এবং শ্রুত বিষয় ধরে রাখার ক্ষমতা;

চ. ক্ষিপ্র গতিতে নোট নেয়ার ক্ষমতা। শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার–জ্ঞান থাকলে ভাল হয়;

ছ. বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের বিষয় (points for decision) এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা;

জ. বিক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ বেছে নেয়ার সামর্থ;

ঝ. অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা;

ঞ. কোন কিছু লিখিত আকারে প্রকাশের ক্ষমতা। কার্যবিবরণী লেখকের ভাষাজ্ঞান ও রচনাশৈলী এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.২ সংক্ষেপে বলতে গেলে কার্যবিবরণী লেখককে হতে হবে ভাল পর্যবেক্ষক, দক্ষ শ্রোতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ও নিপুণ লেখক।

১৪.০ কার্যবিবরণীর প্রধান প্রধান অংশ

১৪.১ সভার কার্যবিবরণীর প্রধান প্রধান অংশ নিম্নরূপঃ

ক. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা;

খ. বোর্ড/কমিটির নাম (সভার ক্রমিক সংখ্যা সহ) (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

গ. সভার তারিখ ও সময়;

ঘ. সভার স্থান (প্রয়োজনে পূর্ণ ঠিকানাসহ);

ঙ. সভাপতির নাম ও পদবী;

চ. সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম ও পদবী। সংখ্যা বেশি হলে নামের তালিকা 'সংযোজনী' আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে;

ছ. আলোচ্য বিষয়সমূহের ধারাবাহিক বিবরণী। আলোচিত প্রতিটি বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা (ক্ষেত্রবিশেষে) এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার ওপর অর্পিত হল, ক্ষেত্রবিশেষে তা উল্লেখ করতে হবে;

জ. সভাপতির স্বাক্ষর, নাম ও পদবী।

১৪.২ সভাপতির স্বাক্ষরের পর কার্যবিবরণীর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের নিকট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ (Endorsement) করবেন সদস্য-সচিব অথবা সংশ্লিষ্ট শংখার base level কর্মকর্তা।

১৪.৩ কার্যবিবরণীর একটি সহজ ফরম্যাট চিত্র ২-এ দেখা যেতে পারে।

চিত্র ২ঃ কার্যবিবরণীর ফরম্যাট

(প্রতিষ্ঠানের নাম)

(ঠিকানা)

................বোর্ড/কমিটির . ... তম সভার কার্যবিবরণী (যদি নিয়মিত সভা হয়)

সভার তারিখ ঃ

সময় ঃ

স্থান ঃ

সভাপতি ঃ

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ

বিষয়-১ ঃ ....

আলোচনা ঃ

১.১

সিদ্ধান্ত ঃ

১.২

ব্যবস্থা গ্রহণঃ..

(সভাপতির স্বাক্ষর)

(নাম)........................

(পদবী) ....

নং

তারিখ ঃ ....

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হ'ল ঃ

১।

২।

৩।

(প্রেরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(নাম) ....

(পদবী) ....

১৫.০ কার্যবিবরণী তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ঃ

১৫.১ কার্যবিবরণী তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

ক. কার্যবিবরণীর লেখক সভা চলাকালে সভাপতির কাছাকাছি বসলে ভাল হয়। এতে বক্তব্য শুনতে ও বুঝতে সুবিধা হয়;

খ. সভা চলাকালে আলোচিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহের নোট নিতে হবে। কার্যবিবরণীতে তথ্য উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখে নিতে হবে;

গ. সভায় আলোচিত বিষয়সমূহ কার্যবিবরণীতে বক্তব্য আকারে নয়, বরং সিদ্ধান্ত আকারে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাহী কার্যক্রমের সভার সিদ্ধান্ত সাধারণত সর্বসম্মত হয়। সংখ্যালঘুরা সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত মেনে নেন। সুতরাং কোন সদস্যের বিশেষ অনুরোধ ব্যতীত কারো নামে কোন বক্তব্য উদ্ধৃত করা সমীচীন নয়। অবশ্য কেউ ভিন্নমত (dissent) প্রকাশ করলে এবং তা' কার্যবিবরণীতে উল্লেখের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে;

ঘ. যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যবিবরণী তৈরি করতে হবে। সম্ভব হলে সভাশেষে একই দিনে, কিংবা তার পরবর্তী কার্যদিবসে কার্যবিবরণী লিখে ফেলা ভাল। দেরি হলে স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়;

ঙ. কার্যবিবরণীর অনুমোদিত খসড়ার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সভাপতি স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করলে ভালো হয়;

চ. খসড়া অনুমোদিত হলে পরিচ্ছন্ন কপি যথাশীঘ্র সম্ভব সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাতে হবে;

ছ. নিয়মিত সভার ক্ষেত্রে/সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী অনুমোদনের (confirmation) বিষয়টি অনুরূপ পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কার্যবিবরণীর কোন সংশোধন হলে তা' পরবর্তী সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।

১৬.০ সার্থক কার্যবিবরণীর বৈশিষ্ট্য

১৬.১ উন্নতমানের কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

ক. সভায় অনুষ্ঠিত আলোচনার সঠিক প্রতিফলন;

খ. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ;

গ. সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পরিপূর্ণ বক্তব্য;

ঘ. সহজবোধ্য ও শুদ্ধ ভাষা। এ প্রসঙ্গে ৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়াবলী স্মরণ করা যেতে পারে।

১৭.০ দুর্বল কার্যবিবরণীর বৈশিষ্ট্য

১৭.১ অনেক কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়ঃ

ক. আলোচিত বিষয়সমূহের অসম্পূর্ণ বিবরণ;

খ. তথ্যগত ত্রুটি–বিচ্যুতি;

গ. উপস্থাপিত বক্তব্যের বিকৃতি;

ঘ. বিচ্ছিন্ন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অহেতুক দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা;

ঙ. অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক প্রকাশভঙ্গি;

চ. দীর্ঘ, জটিল, দুর্বোধ্য ও অশুদ্ধ বাক্য এবং শব্দের বানান ও গঠনগত ত্রুটি।

চিত্র ৩ ঃ সভা–সম্মেলন ব্যবস্থা

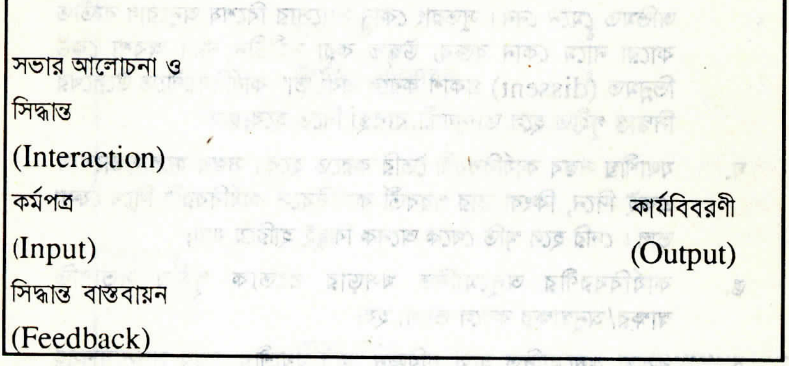

১৮.০ উপসংহার

১৮.১ কর্মপত্র ও কার্যবিবরণী লিখন সভা–সম্মেলন–কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। ভাল কর্মপত্রের অভাবে সভায় অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর আলোচনা এবং সময়ের অপচয় হয়। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে কার্যবিবরণী যথাসময়ে ও যথাযথভাবে লিখিত না হওয়ার কারণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত ও দুরূহ হয়। কর্মপত্র ও কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যকর মাধ্যম। দাপ্তরিক তথা সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উন্নতমানের কর্মপত্র ও কার্যবিবরণী কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন–প্রক্রিয়াকে সহজ করে না, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বলতর করে।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Bieber, Marion (1968), *How to Run a Conference,* London: George Allen and Unnin Ltd.

২. Hegarty, Edward, J (1957), *How to Run Better Meetings,* New York: Mc-Graw Hill Book Company, Inc.

৩. Hon, David (1980), *Meetings that Matter,* New York: John Wiley & Sons, Inc.

৪. Lawton, Philip, E. R. Rigby and L Hall (1987), *Meetings: Their Law and Practice* (4th edn), London: Pitman Publishing.

৫. Locke, Michael (1980), *How to)(Run Committees and Meetings,* London: The Macmillan Press Ltd.

৬. Maude, Barry (1975), *Managing Meetings,* New York: John Wiley & Sons, Inc.

৭. Newport, Cecil A (1960), *The Conduct of Meetings,* (reprinted 3rd edn), London: The English Universities Press Ltd.

৮. বালা, হীরালাল (১৯৯০), *প্রশাসনিক যোগাযোগ,* ঢাকাঃ বুক সিন্ডিকেট।

৯. লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য (১৯৮৮), *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

সাধু ও চলিত ভাষা ঃ চলিত ভাষার উৎপত্তি ও প্রয়োগ রীতি

আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান*

১.০ বাঙলা ভাষায় উৎপত্তি

১.১ অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদের মতে বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছে খ্রিষ্টীয় দশম শতকে। সে অনুযায়ী বাঙলা ভাষার বয়স প্রায় এক হাজার বছর। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পুরো পশ্চিবঙ্গ এবং উড়িষ্যা, বিহার, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরা প্রদেশের অংশ বিশেষসহ বার্মার আরাকানী সম্প্রদায়ের ভাষা বাঙলা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙ্গালীর সংখ্যাসহ বাঙলাভাষীদের মোট সংখ্যা ধরা হয় প্রায় ৩০ কোটি। অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬ শতাংশ লোক এ ভাষায় কথা বলে।

১.২ প্রায় ৩ হাজার বছরেরও পূর্বে ভারতবর্ষে আর্য-জাতির ভাষা ছিল 'আদি আর্য-ভাষা' বা বৈদিক' ভাষা। খ্রিষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতকে পাণিনি ও তাঁর সঙ্গীবৃন্দ বৈদিক ভাষার কিঞ্চিৎ সংস্কার করে একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বিধিবদ্ধ ও সংস্কারকৃত এই ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত ভাষা'। আর্য-জাতি নিজেদেরকে কুলীন মনে করতো এবং অনার্যদেরকে তাদের ভাষা ব্যবহার করতে দিতোনা। এমনকি আর্যদের মধ্যেও জাতি-ভেদ ছিল এবং নিম্ন স্তরের আর্যগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের অধিকার পেতোনা। তাছাড়া এটিকে ধর্মীয় ও পবিত্র ভাষা হিসেবেও গণ্য করা হতো। ফলে নিম্নশ্রেণীর আর্য-জাতি এবং অনার্যদের কথোপকথনে কতিপয় নতুন ভাষা জন্মলাভ করে, যার সাধারণ (common) নাম হয় 'প্রাকৃত ভাষা' বা 'মধ্য-আর্য-ভাষা'। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ হলো 'নিম্নশ্রেণীভূক্ত বা অস্পৃশ্য'। নাম থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রাকৃত ভাষা নিম্ন শ্রেণীর তথা সাধারণ জনগণের ভাষা ছিল। আবার কারও কারও মতে 'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ 'স্বাভাবিক' বা 'স্বভাবসিদ্ধ'। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষে নিজরূপে বিদ্যমান ছিল। কারও কারও মতে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৮ টির মত প্রাকৃত ভাষা বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে পালি, জৈন মাগধী, মহারাষ্ট্রী (মারহাট্টি), শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী ভাষা উল্লেখযোগ্য।

---

* উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১.৩ সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সুলিখিত ও ব্যাকরণ দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল। এই ভাষার বিভিন্ন শব্দের রূপ ও ধ্বনি পরিবর্তন করেই মূলত প্রাকৃত ভাষাশ্রেণী জন্ম লাভ করে। 'মাগধী' প্রাকৃত ভাষা পরে 'অপভ্রংশ' হিসেবে কিছুকাল বিরাজ করে; অতঃপর বাঙলা, বিহারি, আসামি (অহমিয়া) ও ওড়িয়া নামে চারটি আধুনিক ভাষার জন্মদান করে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্ট হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটী, রাজস্থানি, মারাঠি, সিংহলী, পশাই, উর্দু, কাফির, প্রভৃতি আধুনিক ভাষা অন্যতম। ভারত-বর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অনার্য তথা দ্রাবিড় জাতি বাস করতো। এই জাতির ভাষা কালক্রমে তামিল, তেলেগু, তুলু, কানাড়ি, মালয়ালাম, ব্রাহুই, কুরুখ, কুই ও গোন্ডী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দ্রাবিড় ও অষ্টিক ভাষাকেই ভারতবর্ষের আদি ও নিজস্ব ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২.০ বাঙলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

২.১ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙলা ভাষায় প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ শব্দই 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ। বাকি ৫৫ শতাংশের মধ্যেও বিশাল এলাকা জুড়ে আছে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বা তদ্ভব শব্দ। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা বিভিন্নভাবে বাঙলার ৭০ ভাগ শব্দ ভান্ডার দখল করে আছে।

২.২ প্রাচীন দ্রাবিড় ও অষ্টিক জাতির কিছু ব্যবহৃত শব্দ, যা প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে অথবা সরাসরি বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছিল, সেগুলোকেই বাঙলা ভাষার আদিম এবং দেশী শব্দ বলে ধরা হয়। ভাষাবিদদের মতে এর সংখ্যা ৪০টির বেশী ছিলনা। তাই বলা যেতে পারে যে, ৪০টি নিজস্ব শব্দ সম্বল করে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার শব্দ ধার নিয়ে এবং সংস্কৃত ভাষা ভাণ্ডার ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার সাম্রাজ্য; আজ যে ভাষার শব্দ সম্ভার একলক্ষ পঁচিশ হাজার বলে ধারণা করা হয়।

২.৩ বাঙলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও দেশী শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

কলা, কুলা, কামড়, খোকা, খুড়ী, খোঁপা (খোম্পা), খন্দ, গাড়ী, ঘোমটা, চাউল, চাঙারী, ছাল, ঝাড়, ঝাউ, ঝোপ, ঝান্ডা, ঝানু, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙা, টোপর, ডাগর, ডাব, ডাহা, ডাঁসা, ডিঙগা, ঢেউ, ঢিল, ঢেঁকি, তেঁতুল, তামালী, নানা, নীহার, পেট, ফর্সা, মই, মকট, ইত্যাদি।

৩.০ বাঙলা ভাষার যুগ-বিভাগ

৩.১ বাঙলাভাষাকে কালের বিচারে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হলো ঃ

ক)	প্রাচীন যুগ	ঃ	জন্মলগ্ন থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ
খ)	মধ্যযুগ	ঃ	১২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
গ)	আধুনিক যুগ	ঃ	১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত

৩.২ প্রাচীন যুগে বাঙলা ভাষা সুগঠিত ছিলনা এবং এর কোন গদ্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। মূলত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গান বা কবিতার সংকলন। মধ্যযুগের প্রথমে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের পদ্যরূপ প্রধান নিদর্শন বলে বিবেচিত। যেমন,

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, নারায়ণদেব-বিপ্রদাস-বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য প্রভৃতি। মধ্যযুগের শেষ দিকে ষোড়শ শতকে বাঙলাভাষার গদ্যরূপের নিদর্শন মেলে বিভিন্ন রাজাদেশ, পত্র, দলিল, হিতোপদেশ প্রভৃতিতে। ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'পুরোনো বাংলা গদ্য' নামক পুস্তকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, ১৪৫৯-১৫৬৮ সালে আসামের শংকর দেব বাঙলাভাষার গদ্যে 'পত্নীপ্রসাদ', 'রুক্মিনীহরণ', 'রামবিজয়' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। এর কিছুকাল পরে মাধব দেব 'ভোজনব্যবহার', 'চোর ধরা' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। আধুনিক যুগে বাঙলাভাষার গদ্যরূপের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মীর মোশারফ হোসেনের লেখা থেকে আরম্ভ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক হাতে ভাষাটি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের দরবারে এ ভাষার জয়-ঝান্ডা উন্নীত করে তোলেন।

৪.০ বাঙলা ভাষার লিখিত ও কথ্য রূপ

৪.১ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় ভাব প্রকাশের দুটো রূপ প্রচলিত থাকে। একটি সাহিত্যের বা লেখ্য ভাষা, অপরটি দৈনন্দিন কথোপকথনের মৌখিক বা কথ্য ভাষা। লেখ্য ভাষা সর্বদাই ব্যকরণসম্মত এবং ভাষাগাম্ভীর্য দ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু মৌখিক বা কথ্য ভাষায় চটুল ও হালকা শব্দের প্রবণতা অধিকতর হয়। প্রায় সকল ভাষাই কালের বিবর্তনে মৌখিক বা কথ্য ভাষার কিছু শব্দ গ্রহণ করে লেখ্য ভাষাকে গতিশীল করে তোলে।

৪.২ বাঙলাভাষায় লেখ্য ভাষাকে সাধুভাষা এবং মৌখিক বা কথ্য ভাষাকে চলিত বা চলতি ভাষা বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কেবল সাধু ভাষাকেই লেখ্য ভাষা হিসেবে গণ্য করা হতো। ঐ শতাব্দীর শেষাংশে দু'চারজন লেখক চলিত ভাষার শব্দাবলী লেখার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান, যা বৈয়াকরণবৃন্দের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। চলিত ভাষাকে লেখার অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি উপন্যাস ও গল্পের বর্ণনায় সাধুভাষা এবং কথোপকথনে চলিতভাষা সার্থকরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যান্য লেখকদের ক্রমাগত প্রয়াসে বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম বঙ্গের চলিত শব্দাবলী (প্রধানত ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা ও কলকাতা অঞ্চলের চলিত শব্দাবলী) লেখ্য ভাষা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে তাই বাঙলাভাষায় লেখ্য দুটো ভাষা পাওয়া যায়; একটি সাধুভাষা, অপরটি চলিত ভাষা।

৫.০ ক) সাধু ভাষার পরিচয়

৫.১ সাধু ভাষায় সাধারণত তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার বিদ্যমান থাকে এবং ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলো বেশী মাত্রায় প্রযোজ্য হয়। এ ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্ণরূপ (যেমন-খাইয়াছিলাম, পড়িয়াছিলে, চলিয়া, করিয়া প্রভৃতি), সর্বনামের পূর্ণরূপ (যেমন তাঁহারা, যাহারা, সেই দিকে, প্রভৃতি) এবং বিশেষ্য পদের মূল ও পূর্ণ বানান (যেমন-ইচ্ছা, হিসাব, সন্ধ্যা প্রভৃতি) অটুট থাকে। ভাষাটির একটি সহজ গাম্ভীর্য, সুষমা ও

আভিজাত্য আছে। অত্যন্ত ধীর লয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারণ কথ্য ও আঞ্চলিক শব্দ তেমন একটা এ ভাষায় স্থান পায় না।

খ) চলিত ভাষার পরিচয়

৫.২ চলিত ভাষা বাঙ্গালীর প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপ নগরী ও পরে কলকাতার মৌখিক বা কথ্য ভাষা থেকে মূলত জন্মলাভ করেছে। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদগুলো অত্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো, যা দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা কষ্টকর বিবেচিত হয়। ফলে ক্রিয়াপদগুলোকে সংকুচিত করে বাঙলা ভাষার লিখন সহজতর করতে গিয়ে চলিত ভাষা জন্ম নেয়।

৫.৩ বর্তমানে চলিত ভাষায় কেবল ক্রিয়াপদই নয়, বরঞ্চ সর্বনাম, বিশেষ্য, অব্যয় এবং বিশেষণ পদগুলোকেও সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলিত ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, নতুন সৃষ্ট শব্দ, আঞ্চলিক মার্জিত শব্দ এবং শুদ্ধ বানানে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত শব্দকে সে স্থান করে দেয়। ফলে চলিত ভাষাকে চটুল গতিসম্পন্ন জীবন্ত ভাষা বলা হয়।

৫.৪ তাই বলে চলিত ভাষায় অশুদ্ধ বানান বিশিষ্ট এবং নিতান্তই আঞ্চলিক শব্দের (গল্প, উপন্যাস, নাটকে কথোপকথন ছাড়া) প্রবেশাধিকার এখনও স্বীকৃত নয়।

৬.০ সাধু ও চলিত ভাষার উদাহরণ

৬.১ সাধুভাষার উদাহরণ ঃ

"এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম বয়স যাহাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই—ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।"... (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে গৃহীত)

৬.২ চলিত ভাষায় রূপান্তরঃ

"এ সেই বুড়ো সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাওর করতে পারলাম না। কিন্তু মুখের দিকে চাওয়ামাত্রই টের পেলাম, বয়স যাই হোক, খেটে খেটে আর রাত জেগে জেগে এর শরীরে আর কিছু নেই—ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়ে একটু ছোঁয়া দিলে একটু নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঝরে পড়বে।..."

৭.০ চলিত ভাষা উৎপত্তির কারণ

৭.১ বৈয়াকরণদের মতে বাঙ্গালীর সহজাত উচ্চারণ প্রবণতার কারণে শব্দের (বিশেষ করে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের) যে পরিবর্তন সাধিত হয়, কালক্রমে সেই 'ধ্বনি পরিবর্তন রীতি' অনুসারে চলিত শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে এবং চলিত ভাষা জন্ম নিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ধ্বনি পরিবর্তনই চলিত ভাষা উৎপত্তির মূল কারণ। তবে

পরিবর্তিত ধ্বনিরূপ যখন একেবারেই আঞ্চলিক হয়ে পড়ে, তখন চলিত ভাষা তাকে আর গ্রহণ করে না। সে কারণে চলিত শব্দের উৎপত্তিতে নবদ্বীপ নগরী, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা ও কলকাতা শহরের ধ্বনি পরিবর্তন রীতি সিংহভাগ স্থান দখন করে থাকলেও রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম বা বরিশালের পরিবর্তিত ধ্বনি-রূপ চলিত ভাষার শব্দে স্থান লাভ করার তেমন একটা সুযোগ পায়নি। এ প্রবন্ধে 'ধ্বনি পরিবর্তন রীতি'র মূল কারণগুলো আলোচনা করা হবে, যাতে চলিত ভাষা উৎপত্তির কারণ অনুধাবন সম্ভব হয়।

ক) স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptixis বা Vowel Insertion)

৭.২ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে অনেক যুক্তবর্ণ আছে, যেগুলো দুটি বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা গঠিত। যেমনঃ রত্ন, যত্ন, ধর্ম, জন্ম, বর্ষণ, ভ্রূ, ইত্যাদি। এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে মূলত কোন স্বরবর্ণ নেই কিন্তু সাধারণ লোকের উচ্চারণে কষ্ট হতো বলে তারা যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরবর্ণ প্রবেশ করিয়ে সেগুলোকে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে। এভাবেই কালক্রমে ঐ সব শব্দ যথাক্রমে রতন, যতন, ধরম, জনম, বরিষণ, ভুরু ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। এখন পরিবর্তিত শব্দগুলো (বানানসহ) চলিত ভাষার রূপ লাভ করেছে। এরূপ ইংরেজি শব্দ (ফিল্ম-ফিলিম, গ্লাস-গেলাস, ব্রাশ-বুরুশ), ফারসি শব্দ (মর্দ্-মরদ, মুল্‌ক্-মুলুক, সির্ফ্-সেরেফ/শ্রেফ, জখম্-জখম্), আরবি শব্দ (জবেহ্-জবাই) প্রভৃতিতে স্বরবর্ণ যুক্ত হয়েছে।

খ) স্বর-সঙ্গতি (Vowel Harmony)

৭.৩ বাঙলা ভাষার স্বরবর্ণগুলোর মধ্যে উচ্চ, উচ্চ-মধ্য, নিম্ন-মধ্য ও নিম্ন স্বরধ্বনির বিভাগ রয়েছে।

যেমন ঃ	উচ্চ স্বরধ্বনি	=	ই, ঈ, উ, ঊ
	উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি	=	এ, ও
	নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি	=	এ্যা, অ
	নিম্ন স্বরধ্বনি	=	আ

যখন একটি শব্দের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন স্বরধ্বনির অবস্থান থাকে, তখন বাঙ্গালী তার সহজাত উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় দুটো মাত্রার স্বরধ্বনির মধ্যে একটা স্বর সঙ্গতি বিধান করে উচ্চারণ করে। যেমন- 'ইচ্ছা' শব্দটির প্রথম মাত্রায় উচ্চ স্বরধ্বনি 'ই' আছে এবং দ্বিতীয় মাত্রায় 'চ্ছা' (আ) নিম্ন স্বরধ্বনি আছে। চলিত উচ্চারণে 'ই' ও 'আ' এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে (ই+এ) 'ইচ্ছে' শব্দ জন্ম নিয়েছে। তেমনিভাবে হিসাব-হিসেব, সন্ধ্যা-সন্ধ্যে প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে স্বর-সঙ্গতি বিশেষভাবে বিদ্যমান। যেমনঃ লিখা-লেখা, গিলা-গেলা, মিশা-মেশা, গুণা-গোণা, শুনা-শোনা প্রভৃতি চলিত ক্রিয়া পদ সৃষ্টির কারণ।

গ) অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি (Epenthesis and Vowel Mutation)

৭.৪ শব্দের মধ্যে ই-কার বা উ-কার থাকলে তাকে সেই বর্ণের পূর্বে 'ই' বা 'উ' বর্ণ বসিয়ে পূর্ণ রূপে উচ্চারণ করার একটা প্রবণতা বহু পূর্ব থেকেই বাঙলাভাষীদের মধ্যে

(বিভাষ করে পূর্ব বঙ্গে) বিদ্যমান আছে। যেমন 'রাখিয়া' শব্দটির 'খি' বর্ণের ই-কারকে পূর্ণ 'ই' বর্ণ হিসেবে পূর্বে বসিয়ে 'রাইখ্যা' এরূপ উচ্চারণ করা হয়। তেমনিভাবে 'চলিয়া'–চইল্যা, বলিয়া–বইল্যা, প্রভৃতি বাঙ্গালীর সহজাত উচ্চারণ। এরূপ উচ্চারণ ভঙ্গিকে 'অপিনিহিতি' বলা হয়। এই অপিনিহিতি যখন একটু মার্জিত রূপ গ্রহণ করে তখন সেই রূপকে 'অভিশ্রুতি' বলে।

যেমনঃ

মূল শব্দ	অপিনিহিতি	অভিশ্রুতি
আজি	আইজ	আজ
জালিয়া	জাইল্যা	জেলে
রাতি	রাইত	রাত
মাঝুয়া	মাউঝুয়া	মেঝো/মেজো
চারি	চাইর	চার
নড়িল	নইড়লো	নড়লো
বলিব	বইলবো	বলবো
ধরিল	ধইরলো	ধরলো
করিয়া	কইর‍্যা	করে
নাচিব	নাইচবো	নাচবো
আসিয়া	আইস্যা	এসে

ঘ) 'র' ও 'হ' বর্ণ লোপ করার প্রবণতা (Tendency to Drop Internal 'R' and 'H')

৭.৫ বাঙ্গালীর বিশেষ করে কলকাতাবাসীদের মধ্যে শব্দের মধ্যস্থিত 'র' ও 'হ' লোপ করে উচ্চারণ করার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। এর ফলে তৎসম ও বিদেশি শব্দাবলীর মধ্যস্থিত 'র' কে বিলুপ্ত করে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব ঘটানো হয়। শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত 'হ' কে পূর্ণ লুপ্ত অথবা পরিবর্তে 'ই' ব্যবহার করার আধিক্যহেতু নতুন নতুন চলিত শব্দ জন্ম নিয়েছে। এখানে 'র' ও 'হ' বিলুপ্তকৃত কতিপয় শব্দের উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১। র–বর্ণ লোপ কৃত শব্দ

মূল শব্দ	চলিতে ব্যবহৃত শব্দ
গৃহিনী (গিরহিনী)	গিন্নী
কর্তা	কত্তা
মূর্খ	মুখ্যু
ধর্ণা (ধরণা)	ধন্না
ঠাকুরদাদা	ঠাকুদ্দা
সূর্য্য	সুজ্জি
কর্ম	কম্ম
শিরিনী (ফারসি)	শিন্নি
সরদার (")	সদ্দার
কুরনিশ (")	কুন্নিশ

২। 'হ' বর্ণ লোপকৃত শব্দ

মূল শব্দ	চলিতে ব্যবহৃত শব্দ
ফলাহার	ফলার
মালদহ্	মালদা
বাহান্ন	বায়ান্নো
তেহাত্তর	তিয়াত্তর
পহেলা	পয়লা
বাহিরে	বাইরে
ঠাহর	ঠাওর/ঠাউর
বহি	বই
সহি	সই
কেহ্	কেও
চাহনি	চাউনি
গহণা	গয়না
চাহিয়া	চেয়ে
গাহিয়া	গেয়ে
বহিয়া	বয়ে
সহিয়া	সয়ে
শিহরিয়া	শিউরে
কহিয়া	কয়ে
রহিয়া	রয়ে
নাহিয়া	নেয়ে
সিপাহী (ফারসি)	সেপাই
সুরাহী (")	সোরাই
আলাহিদা (")	আলাদা
শাহ্ (")	শা
পর্দাহ্ (")	পর্দা

ঙ) দ্বিমাত্রিকতার প্রভাব (Dimetrism/Bimorism)

৭.৬ বাঙলাভাষীদের আরেকটি প্রবণতা হলো যে কোন শব্দকে দুটি মাত্রায় উচ্চারণ করা। যেমনঃ- 'চ-লো' শব্দটিকে দুটি মাত্রায় উচ্চারণ করা হয়। এখানে 'চ' বর্ণ ও 'লো' বর্ণ উচ্চারণে পৃথকভাবে যতটা সময়ের দৈর্ঘ্য মেনে চলতে হয়, তাকে একেকটি মাত্রা বলে। 'চলো' শব্দটি উচ্চারণে দুটি মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙ্গালী মাত্রেই প্রতিটি শব্দকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে এরূপ দু'মাত্রায় ভাগ করে নেবার প্রবণতা বিরাজমান। একে 'দ্বি-মাত্রিকতা' বলে। এই দ্বি-মাত্রিকতা চলিত শব্দ সৃষ্টিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলে। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

মূল শব্দ	দ্বি-মাত্রিকতার ফল
রাখিলাম	রাখ্-লাম
চলিলাম	চল্-লাম
বলিবার	বল্-বার
ধরিবার	ধর্-বার
মারিবার	মার্-বার
ভাগিনেয়	ভাগ্-নে
পাগলী	পাগ্-লী
চলিয়া	চ-লে
মারিয়া	মে-রে
আসিয়া	এ-সে
তুলিয়া	তু-লে

৮.০ বাক্য গঠনে সাধু ও চলিত ভাষা

৮.১ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বাঙ্গালীর মধ্যে এত তীব্র হয়েছে যে, সাধু ভাষায় রচিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, প্রতিবেদন, সংবাদ প্রভৃতির অস্তিত্ব এখন প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। কথোপকথন ও ভাষণে বহুদিন থেকেই চলিত ভাষা প্রায় সকল স্থান দখল করে নিয়েছিল; ইদানীং লেখ্য রূপেও চলিত ভাষার প্রচলন প্রায় সর্বত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে সাধু ভাষা এবং শেষে চলিত ভাষায় তাঁদের রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। সাধু ভাষায় লেখা হ্রাস পাবার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, সাধু ভাষায় দেশি ও বিদেশি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র যথেষ্ট সীমিত, বরঞ্চ তৎসম শব্দের আধিক্য প্রবল। অথচ গতিময় লেখার জন্য তদ্ভব,দেশি ও বিদেশি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন ক্রমাগত বেশি করে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানব জীবনে ব্যস্ততা এবং যুগ-যন্ত্রণা বর্তমানে অনেক বেশী ক্রিয়াশীল; তাই সাধু ভাষার প্রলম্বিত শব্দাবলী প্রয়োগপূর্বক লেখা অব্যাহত রাখার মত সময় লেখকের ভান্ডারে খুব বেশি আর অবশিষ্ট নেই।

৮.২ গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে সাধু ও চলিতের মধ্যে কোন পার্থক্য বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর নেই। এখন যে কোন ভাষায় লেখা যায় এবং তা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু একটি প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা উপন্যাসে যুগপৎভাবে সাধু ও চলিত দুটো ভাষার শব্দাবলী ব্যবহার কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। বৈয়াকরণদের নিকট এটি কেবল ত্রুটিই নয়, বরঞ্চ অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। একে 'গুরুচন্ডালী' বিচ্যুতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাই লেখককে প্রথমেই মনস্থ করে নিতে হবে, তিনি সাধু না কি চলিত ভাষায় লিখবেন। দু'টির মিশ্রণ দূষণীয়, তাই পরিত্যাজ্য। কেবল উদ্ধৃতি ও সংলাপের ক্ষেত্র ছাড়া সাধু ও চলিত ভাষার একত্রে মিশ্রণ একটি উঁচু মানের লেখার সৌকর্য বিনষ্ট করে দেয়।

৮.৩ অনেকের ধারণা, চলিত ভাষায় লেখা সহজ ও অনায়াসলব্ধ একটি কাজ, সুতরাং এর জন্য কোন অনুশীলন বা অভিধান পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। এ ধারণার ফলে

চলিত ভাষায় বিস্তর দৃষ্টিকটু সাধু শব্দ এবং অপ্রযোজ্য শব্দবালীর মিশ্রণ ঘটছে। বাঙলা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সাধু অথবা যথার্থ চলিত ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু চলিত ভাষার প্রচলন আজ প্রায় সর্বত্র, তাই যথার্থ চলিত ভাষা প্রয়োগের নিয়মাবলী ও যথাশব্দ ব্যবহারে সকলকেই তৎপর হতে হবে। স্মর্তব্য, চলিত ভাষায় লিখিত বাক্যের মধ্যে কেবল একটি বেমানান সাধু শব্দ পুরো বাক্যটিকে কলুষিত করে দেয়।

৯.০ চলিত ভাষার প্রয়োগ রীতি

৯.১ চলিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে লেখককে ক্রিয়াপদগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতে হয়। কারণ, সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় আগমন কালে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটে ক্রিয়াপদের। ক্রিয়াপদের পরিবর্তিত বানান নির্ভুল করতে হয় এবং কতিপয় ক্রিয়াপদের প্রয়োগে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়।

যেমন ঃ আমি ভোরে উঠি
তুমি ভোরে ওঠো
সে ভোরে ওঠে

এই বাক্যত্রয়ে 'উঠি' 'ওঠো' ও 'ওঠে' ক্রিয়াপদ লক্ষণীয়। তেমনি, আমি ফুল তুলি, তুমি ফুল তোল (তোলো), সে ফুল তোলে; এরূপ বাক্যে 'তোলা' ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সাবধানে না করলে 'সে ফুল তুলে' এরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। শুনা, ঘুরা, ডুবা, ঝুলা, ছুটা, বুঝা, উড়া, ঢুলা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৯.২ কিছু কিছু ক্রিয়া পদে আরও জটিলতা দেখা দেয়। যেমনঃ সে কোন কিছু চাইতে পারে না' বাক্যটিকে অনেকে লেখেন 'সে কোন কিছু চেতে পারেনা'। 'চেতে' শব্দটি ক্রিয়া পদের সঠিক রূপান্তর হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে লেখকের সজাগ দৃষ্টি না থাকায় এরূপ বিভ্রম ঘটে। চাইতে, নাইতে, গাইতে, গাইলে এই চারটি ক্রিয়াপদকে তাদের নিজরূপেই প্রকাশ করতে হবে। চেতে, নেতে, গেতে, গেলে, এরূপ চলিত শব্দ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অশুদ্ধ রূপ বলে বিবেচিত। (ডঃ সুনীতি কুমার দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৪৩)

৯.৩ কয়েকটি ক্রিয়া পদের সাধু ও চলিত রূপ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ	সাধুরূপ	চলিত রূপ
হইতেছে	হচ্ছে	দেওয়া	দেয়া
করিয়াছিল	করেছিল	নেওয়া	নেয়া
শুইয়াছিল	শুয়েছিল	গাহিয়াছে	গেয়েছে
কাটিয়াছে	কেটেছে	পাইবে	পাবে
লেখিবার	লিখবার	দেখিয়াছিল	দেখেছিল
লেখিয়াছি	লিখেছি	জানাইয়াছেন	জানিয়েছেন
শুনিয়া	শুনে	পৌছিয়াছেন	পৌচেছেন
শুনা	শোনা	পড়াইতেছে	পড়াচ্ছে

গুনা	গোনা	ছুটাছুটি করা	ছোটাছুটি করা
চাহিয়াছে	চেয়েছে	সাজাইয়াছে	সাজিয়েছে
তুলা	তোলা		
হইবে	হবে		
গিয়াছিল	গিয়েছিল		

(বিঃ দ্রঃ 'দেওয়া,' 'নেওয়া' ক্রিয়া দুটিকে অনেকে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতি)

৯.৪ ক্রিয়াপদের পরে লেখককে সর্বনাম পদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, চলিত ভাষা প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়ে সর্বনাম পদে। চলিত ভাষায় লিখিত অনেক বিজ্ঞপ্তির শেষে লেখা থাকে "ইহা সকলের অবগতির জন্য জারি করা হলো।" এ বাক্যে 'ইহা' সর্বনামের ব্যবহার পুরো বিজ্ঞপ্তিটিকেই মলিন করে ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যটিকে একটু ঘুরিয়ে এভাবে লেখা সমীচীন হবে, "সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।" সর্বনাম পদের ইহা, উহা, তাহা, ইহাই, উহাই, তাহাই, যাহাই, প্রভৃতি শব্দাবলী চলিত ভাষায় ব্যবহার করা কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। এক্ষেত্রে এটা, সেটা, এটি, সেটি, তা, তাই, এটিই, সেটিই,তাই (ই), যাই, প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে অথবা বাক্যটিকে কিঞ্চিৎ পাল্টিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

এখানে কয়েকটি সর্বনাম পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ
তাহারা	তারা
তাহাদের	তাদের
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদিগকে	এদেরকে
এই	এ (তবে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'এই' ব্যবহৃত হতে পারে)
কাহাদের	কাদের
ইহাতে	এতে
ইহা	এ/এই/এটা/এটি
উহা	তা/সেটা/সেটি
উহাতে	ওতে
কাহাকেও	কাউকেই
যাহারা	যারা
বালকগুলি	বালকেরা/বালকগুলো (পশ্চিমবঙ্গে 'বালকগুলি' শব্দটি গ্রাহ্য)

৯.৫ বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে দেশি ও বিদেশি শব্দও ব্যবহার করা যায়। রাত্রি, বৈকাল, সন্ধ্যা, অদ্য, হিংসা, চক্ষু, চন্দ্র, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে রাত, বিকেল, সন্ধ্যে, আজ, হিংসে, চোখ, চাঁদ, প্রভৃতির ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি স্থানের নামের ক্ষেত্রেও চলিত শব্দ থাকলে তা প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ 'যশোহর' এর স্থলে 'যশোর',

গুনা	গোনা	ছুটাছুটি করা	ছোটাছুটি করা
চাহিয়াছে	চেয়েছে	সাজাইয়াছে	সাজিয়েছে
তুলা	তোলা		
হইবে	হবে		
গিয়াছিল	গিয়েছিল		

(বিঃ দ্রঃ 'দেওয়া,' 'নেওয়া' ক্রিয়া দুটিকে অনেকে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতি)

৯.৪ ক্রিয়াপদের পরে লেখককে সর্বনাম পদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, চলিত ভাষা প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়ে সর্বনাম পদে। চলিত ভাষায় লিখিত অনেক বিজ্ঞপ্তির শেষে লেখা থাকে "ইহা সকলের অবগতির জন্য জারি করা হলো।" এ বাক্যে 'ইহা' সর্বনামের ব্যবহার পুরো বিজ্ঞপ্তিটিকেই মলিন করে ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যটিকে একটু ঘুরিয়ে এভাবে লেখা সমীচীন হবে, "সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।" সর্বনাম পদের ইহা, উহা, তাহা, ইহাই, উহাই, তাহাই, যাহাই, প্রভৃতি শব্দাবলী চলিত ভাষায় ব্যবহার করা কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। এক্ষেত্রে এটা, সেটা, এটি, সেটি, তা, তাই, এটিই, সেটিই,তাই (ই), যাই, প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে অথবা বাক্যটিকে কিঞ্চিৎ পাল্টিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

এখানে কয়েকটি সর্বনাম পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ
তাহারা	তারা
তাহাদের	তাদের
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদিগকে	এদেরকে
এই	এ (তবে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'এই' ব্যবহৃত হতে পারে)
কাহাদের	কাদের
ইহাতে	এতে
ইহা	এ/এই/এটা/এটি
উহা	তা/সেটা/সেটি
উহাতে	ওতে
কাহাকেও	কাউকেই
যাহারা	যারা
বালকগুলি	বালকেরা/বালকগুলো (পশ্চিমবঙ্গে 'বালকগুলি' শব্দটি গ্রাহ্য)

৯.৫ বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে দেশি ও বিদেশি শব্দও ব্যবহার করা যায়। রাত্রি, বৈকাল, সন্ধ্যা, অদ্য, হিংসা, চক্ষু, চন্দ্র, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে রাত, বিকেল, সন্ধ্যে, আজ, হিংসে, চোখ, চাঁদ, প্রভৃতির ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি স্থানের নামের ক্ষেত্রেও চলিত শব্দ থাকলে তা প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ 'যশোহর' এর স্থলে 'যশোর',

'মালদহ' এর স্থলে 'মালদা' প্রভৃতি। উল্লেখ্য, পশ্চিম বঙ্গের অনেক লেখক ও সাহিত্যিক 'সন্ধ্যা' শব্দটিকে চলিতে অপরিবর্তনীয় রাখার পক্ষপাতি।

এখানে কয়েকটি বিশেষ্য পদের সাধু ও চলিত রূপ বর্ণিত হলো ঃ

সাধু রূপ	চলিত রূপ
বিবাহ	বিয়ে
ভিতর	ভেতর
অভ্যাস	অভ্যেস
দিবারাত্রি	দিনরাত
তুলা	তুলো
বানর (বান্দর)	বাঁদর
ভ্রাতা/ভগ্নী	ভাই/বোন
রওয়ানা	রওনা ('রওয়ানা' শব্দটিও চলিতে ব্যবহারযোগ্য)
জুতা	জুতো
সূতা	সুতো
ঔষধ	ওষুধ
উঠান	উঠোন
খেলাধূলা	খেলাধুলো ('খেলাধুলা' বানানটিও গ্রাহ্য)
বৎসর	বছর
জানালা	জান্‌লা
ভিটামাটি	ভিটেমাটি
ভিখারী	ভিখিরি
ক্ষুধা	খিদে

৯.৬ চলিত ভাষায় বিশেষণ পদগুলোও পরিবর্তনে পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে অভিশ্রুতির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষণ পদ চলিত ভাষায় ব্যবহার্য। সেই সংগে দেশি ও বিদেশি বিশেষণ পদ চলিতে ব্যবহার করতে হয়। স্মরণীয়, তৎসম শব্দের বিশেষণ পদগুলো অত্যন্ত প্রলম্বিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। চলিত ভাষায় সেগুলো অনেক সময় খাপছাড়া ঠেকে। তাই সহজ ও সাবলীল বিশেষণ পদ সংযুক্ত করতে হবে। যেমন, মন্থর, অগ্রে, উচ্চ-নিম্ন, ভগ্ন, ক্রোড়পতি, প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে ধীর, আগে, উঁচু-নিচু, ভাঙ্গা, কোটিপতি, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

এখানে কয়েকটি বিশেষণ পদের উদাহরণ প্রদত্ত হলো ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ
মিথ্যাবাদী	মিথ্যেবাদী
চাকুরীজীবী	চাকরিজীবী/চাকুরে
পহেলা	পয়লা
নূতন	নতুন
আদ্যপ্রান্ত	আগাগোড়া
আমোদপ্রিয়	আমুদে
আগামী	আসছে
গ্রাম্য	গেঁয়ো
তদ্রুপ	সেরূপ

এতদর্থে	এজন্য/এ অর্থে
পুরাতন	পুরোনো
লাগসহি (Appropriate)	লাগসই
বৃদ্ধ	বুড়ো
বিলাতী	বিলিতি/বিলেতি
অন্ধকারাচ্ছন্ন	আঁধারময়
হিসাবী	হিসেবি
অলস	আলসে
আদরের/আদরপ্রিয়	আদুরে
শহরের/শহরবাসী	শহুরে
পূর্ণ/সম্পূর্ণ	পুরো/পুরোপুরি

৯.৭ অনেকের ধারণা 'অব্যয়' পদগুলো যেহেতু ব্যাকরণ অনুসারে "যার কোন ব্যয় বা পরিবর্তন নেই, তাই অব্যয় পদ", তাই এগুলো চলিত ভাষায় তৎসম রূপেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাস্তবে অব্যয় পদ ব্যয় বা পরিবর্তনহীন হলেও চলিত শব্দে তার রূপ পরিবর্তন সুস্পষ্ট। সুতরাং অব্যয় পদের চলিত রূপই চলিত ভাষায় ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য এক্ষণে, উপরন্তু, অধিকন্তু, প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে এখন, এ ছাড়া/এ ছাড়াও, তা ছাড়াও, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখানে সচরাচর ভ্রান্তিযোগ্য কয়েকটি অব্যয় পদের চলিত রূপ দেখানো হলো ঃ

সাধু রূপ	চলিত রূপ
যদ্যপি	যদিও
এযাবৎ	এখন পর্যন্ত
আদপে	আদৌ
ঈষৎ	কিঞ্চিৎ/কিছুটা
অবধি	থেকে/হতে/পর্যন্ত
সহসা	হঠাৎ/সে সময়ে
কদাচিৎ	কালে ভদ্রে/কখনও কখনও

১০.০ উপসংহার

চলিত ভাষার ব্যাপক প্রচলন বাঙলা ভাষাকে গতিশীল ও সহজবোধ্য করে তুলেছে। এতে ভাষার প্রসার দ্রুততর ও ব্যাপকতর হবে। সাধারণের মনের কথাগুলো সহজভাবে প্রকাশের জন্য এর অবারিত বিচরণক্ষেত্র নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসচেতনতা ও যথাশব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অলসতাজনিত বিচ্যুতি এর গুণগত মান খর্ব করে দিচ্ছে। প্রায়শ গুরু–চন্ডালীর অবাধ রাজত্ব কায়েমের সীমাহীন তৎপরতা 'চলিত ভাষা'র শ্বেতবস্ত্রকে মলিন করে চলেছে। শুধু প্রসারের ব্যাপকতা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করে না। গুণগত মানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাধনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, যা এ মুহূর্তে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস যদি কাম্য হয়, এর যথার্থতা ও বিশুদ্ধরূপও কাম্য হওয়া উচিৎ। তার জন্য অনুশীলন, অধ্যবসায় ও মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ভাষা শিক্ষা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাঃ (১৯৯৪) *মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাঃ, (১৯৮৫) *বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। আজাদ, হুমায়ুন (১৯৮৮) *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৪। ডঃ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, (১৯৮৯) *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সম্পাঃ, (১৯৯৩) *বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৬। ডঃ চৌধুরী, আবুল কাশেম (১৯৮৫) *উচ্চতর ব্যবহারিক ভাষা ও রচনা*, তরুণ লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৭। চৌধুরী, জামিল (১৯৯৩) *বানান ও উচ্চারণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮। জামান, আনিসুজ, (১৯৮৪) *পুরোনো বাংলা গদ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমী, (১৯৮৬) *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, কলকাতা।

১০। বিশ্বাস, নরেন, (১৩৯৪) *বাঙলা উচ্চারণের সংক্ষিপ্ত সূত্রাবলী* ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১। রহিম, আব্দুর (১৩৮২) *সোনার বাঙলা অভিধান*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১২। লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য, সম্পাঃ, (১৯৮৮) *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩। সেন, সুকুমার, (১৯৭৫) *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা

১৪। হক, মহাম্মদ দানীউল, (১৯৯৪) *ভাষা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

দুর্যোগের সাথে বেঁচে থাকা
ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ ঃ একটি সমীক্ষা

আব্দুর রউফ, ডাক্তার গোলাম মওলা, ফেরদৌসী বেগম, সালমা বেগম, মোঃ শাহজাহান, আব্দুল্লাহ আল মাহবুবুর রশীদ, ডাঃ নাজমা বেগম, মাহফুজা বেগম*

১.০ ভূমিকা

১.১ মানুষের মৌলিক অভিপ্রায় বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার লক্ষ্যেই সে নিয়োগ করে তার যাবতীয় স্পৃহা, উদ্যম আর উদ্দীপনা। যুদ্ধে সে লড়াই করে, বাঁধ নির্মাণ করে, ফসল বোনে, প্রকৃতির বিপক্ষে দাঁড়ায় কিংবা তার সঙ্গে স্থাপন করে সখ্য।

১.২ বাংলাদেশ নামক গাঙ্গেয় ব-দ্বীপটির চিরস্থায়ী শত্রু হচ্ছে এর ভূগোল। অবস্থানগত দূর্বলতার কারণেই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস নামের প্রাকৃতিক দূর্যোগ বারংবার হৃদয়হীন তস্করের মত অনায়াসে হানা দিতে পেরেছে এ দেশের সহায়হীন মানুষের জীবনে, লুণ্ঠন করতে পেরেছে অসংখ্য প্রাণ, ক্ষেতের ফসল, কষ্টার্জিত সম্পদ। ফলে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকে, বেঁচে থাকবার প্রবল ব্যাকুলতা নিয়ে তারা গড়ে তুলেছে দূর্যোগ মোকাবেলার নিজস্ব সংস্কৃতি।

১.৩ ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যায় শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়। জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলের মানুষ কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, কীভাবে ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছেন, দুর্যোগকালে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সাহায্য সহযোগিতার স্বরূপ এবং ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস

* বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত ষোড়শ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শিক্ষাসফরের কর্মসূচি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ ১৯৯১ সালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় 'দুর্যোগের সঙ্গে বেঁচে থাকাঃ ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১' শীর্ষক এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। পাঠক্রমের ২০২জন প্রশিক্ষণার্থীকে মোট ৫০টি দলে বিভক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত ঐ সমস্ত এলাকায় অবস্থান করে সমীক্ষাটি পরিচালনা করে এবং রিপোর্ট আকারে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। এই প্রতিবেদনটি নোয়াখালী সদর থানার চরবাটা ইউনিয়নে অবস্থানকারী ২৯ ও ৩০ নং দলের সদস্যরা যৌথভাবে প্রণয়ন করেন।

মোকাবিলায় কী কী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উপদ্রুত মানুষের জীবন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের কাছ থেকে উপর্যুক্ত বিষয়ে সরাসরি অভিমত সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ষোড়শ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ সমীক্ষাধর্মী প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

১.৪ বিষয়ের গুরুত্ব ঃ

১.৪.১ এ-দেশের মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সংঘটিত দুর্যোগের একটি ধারাবাহিক চিত্র যদি রচনা করা হয়, দেখা যাবে, একটি দুর্যোগের ধ্বংসলীলা কাটিয়ে নতুন জীবন সূচনার আগেই পূনর্বার বেজে উঠেছে এর পদধ্বনি। সমুদ্রের উপকূলে জেগে-ওঠা চরাঞ্চল কিংবা দ্বীপগুলোতে বসতি স্থাপন করেছে যে বিপুল উদ্বাস্তু মানবগোষ্ঠী, বস্তুতপক্ষে বারবার তারাই হয়েছে এর প্রধান শিকার। বাংলাদেশ নামের এই সীমিত সম্পদের উন্নয়নকামী রাষ্টটি তার দুর্যোগগ্রস্থ নাগরিকদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের প্রয়াসে যে-সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ফলে কেবলই প্রকৃতির হাতে আত্ম সমর্পণ করেছে উপকূলের মানুষ, বেঁচে থাকার অসম্ভব লড়াই শেষে সর্বস্বহারা হয়ে পুনরায় রচনা করেছে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারই উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাহত হচ্ছে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াস। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার ফলে বাড়ছে পরনির্ভরতা, ক্রমশই রক্তশূন্য হয়ে উঠছে অর্থনীতি। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতি আজ সোচ্চার।

১.৪.২ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। সুতরাং সময় এসেছে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসনের পরিকল্পনা রচনার চেয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগ কালে মানুষের জীবন ও বস্তুগত ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার কার্যকর, বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেবার। এই আলোকে উপদ্রুত উপকূলের মানুষের জীবনাচরণ, দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের নিজস্ব সামর্থ, প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থার গৃহীত পন্থাসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা, পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ার গতিশীল পরিবর্তন, দুর্যোগপরবর্তী সময়ে প্রয়োজনসমূহের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ, তৃণমূল পর্যায়ে সরেজমিনে সফরের মাধ্যমে বিপন্ন মানুষদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ সকল তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি বাস্তবানুগ ও লক্ষ্যভেদী কর্মসুচি গ্রহণকে চূড়ান্ত অভিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করলে, তা অর্জনের পথে এই বিষয়টি সহায়ক হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার।

১.৫ সমীক্ষার উদ্দশ্যঃ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এই সমীক্ষার মাধ্যমে ঃ

ক) ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে সংঘটিত প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসের মুখে সমীক্ষাধীন এলাকার মানুষ কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন,

খ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস কীভাবে মোকাবিলা করেছেন,

গ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সাহায্য-সহযোগিতার স্বরূপ কী ছিল,

ঘ) ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা করার জন্য কী কী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১.৪ সমীক্ষার পরিধিঃ

১৯৯১ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ০৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। চার সদস্যের গ্রুপ হিসেবে দুটি গ্রুপকে নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন দুটি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন; যথাক্রমে চরবাটা ও চরক্লার্কে সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্তার বিচ্ছিন্নতা, প্রবল বর্ষণ, বৈরী আবহাওয়া এবং সর্বোপরি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক চরক্লার্কে সমীক্ষা পরিচালনার পরিবর্তে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পরিধি চরবাটা ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

২.০ গবেষণা পদ্ধতি

২.০১ পদ্ধতিগত ভাবে এ গবেষণাটি ঘটনা সমীক্ষা হলেও নমুনা চয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস ও মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত/তথ্য আহরণ করা হয়েছে। চরবাটা ইউনিয়নের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি গ্রাম থেকে সরবরাহকৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রত্যেকটি দল উপাত্ত সংগ্রহ করেন। সমীক্ষাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য/ কর্মীদের কাছ থেকে দূর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। এলাকার মানচিত্র তৈরী, নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে চিহ্নিতকরণ, সাক্ষাৎপ্রদানকারী ও সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর মধ্যেকার ভাষাগত ব্যবধান মোচন করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/ কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, ছাত্র/রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য ও কতিপয় শিক্ষিত, সচেতন ব্যক্তির সাথেও অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

২.০২ নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর সমীক্ষা চালানোর লক্ষ্যে সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নপত্র সমূহ পূরণ করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, সারণীকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাকে অনুধাবন এবং সমাধানের জন্য নির্ধারিত ছক এবং বিষয়বস্তুর আঙ্গিক কাঠামোর সীমারেখার মধ্য থেকে দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১ নমুনায়ন পদ্ধতিঃ

নোয়াখালী সদর থানার চরবাটা ইউনিয়নে পরিচালিত সমীক্ষায় নমুনা একক নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্য দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ১০ জন পরিবার প্রধান/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও জেলা/উপজেলা প্রশাসন থেকে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

২.২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিঃ

উপাত্ত সংগ্রহে প্রশ্নপত্রসহ সাক্ষ্যৎকার পদ্ধতিকে বেছে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষাধীন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে দৈবচয়িত নমুনা এককের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে সকল প্রশ্নপত্র। যদিও প্রাথমিক উৎসই ছিল উপাত্ত সংগ্রহের মূল ভিত্তি, তথাপি ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়-উত্তর সময়ে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত দূর্যোগ-ত্রাণ ব্যবস্থাপনা রিপোর্টসমূহও উপাত্ত সংগ্রহের পরিপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করেছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বরদের সাথে সরাসরি আলোচনাও উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা করেছে।

২.৩ উপাত্ত উপস্থাপন কৌশলঃ

উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এগুলো পরিস্ফূটন ও বোধগম্য করার নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সারণী, পাইচার্ট, বার ডায়াগ্রামসহ সাধারণ পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি। একই সাথে উপাত্ত উপস্থাপনের পেশা নির্বিশেষে উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.৪ সীমাবদ্ধতাঃ

ক) নোয়াখালী সদরের সাথে সমীক্ষাধীন এলাকা চরবাটা ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তা এমনিতেই চলাচলের উপযোগী নয়, তদুপরি সমীক্ষা চলাকালীন উপর্যুপরি প্রবল বর্ষণে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ায় ইউনিয়ন দু'টিও অগম্য হয়ে উঠে। বিশেষত চরক্লার্ক ইউনিয়নে গমন করা ছিল একেবারেই দুঃসাধ্য ফলে সমীক্ষা কেবলমাত্র চরবাটা ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

খ) সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী ও উত্তরদাতার ভাষা পরস্পরের নিকট সহজবোধ্য ছিলনা বিধায় উপাত্ত সংগ্রহে কিছুটা অসুবিধা হয়।

গ) প্রশ্নপত্রের অসামঞ্জস্যতা সংগৃহীত উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে।

ঘ) সমীক্ষাধীন এলাকার কিছু কিছু লোক প্রশ্নের উত্তর দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। কারণ তারা মনে করেন এসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

৩.০ প্রাপ্ত তথ্যাদির সুবিন্যস্ত বর্ণনা

৩.০১ সমীক্ষাধীন এলাকায় দৈবচয়িত নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৮০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রধানের সাথে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে ৯১'এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে তাদের প্রস্তুতি, দুর্যোগকালে মানসিক অবস্থা, দুর্যোগ-উত্তর সময়ে পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং স্থানীয় প্রশাসন/সংস্থা/ব্যক্তির ভূমিকা, সর্বোপরি ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যক্তিগত ও যৌথ পরিকল্পনা ইত্যাকার বিষয়ে যে-সকল তথ্য/অভিমত/প্রস্তাব সংগৃহীত হয়েছে, পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদগুলোতে তা উপাত্ত ও সারণীর সহায়তায় উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ

সাক্ষাৎ প্রদানকারী পরিবার সমূহের জীবনধারণের প্রণালী এবং দূর্যোগ মুহূর্তে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের আচরণের কারণগুলো নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে পরিবারগুলোর অবস্থান সনাক্ত করা জরুরী। সমীক্ষাধীন ৮০টি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের স্বরূপটি এরকম ঃ কৃষিজীবী ২৭, মৎস্যজীবী-১৯, দিনমজুর-১৩, অন্যান্য-২১ (রিক্সাচালক, কুলি, বর্গাচাষী, গৃহবধূ), ৮০টি পরিবারের সদস্য সংখ্যার গড়-৭ জন। নিম্নে সারণী-১ ও সারণী-২ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ভূমি ও মাসিক আয় ভিত্তিক শ্রেণীকরণের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-১

ভূমির পরিমাণ ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার
সম্পূর্ণ ভূমিহীন	৪২	৫২.৫
সামান্যভূমির অধিকারী (০-৩ একর)	৩৫	৪৩.৭৪
৩ একরের উর্দ্ধে	৩	৩.৭৫

সারণী-২

মাসিক আয় ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার
৫০০ টাকা পর্যন্ত	৯	১১.২৫
৫০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৬	৫৭.৫
১০০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত	২২	২৭.৫
২০০১ টাকা ও তদুর্দ্ধ	৩	৩.৭৫

উপরে বর্ণিত সমীক্ষাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জীবিকা নির্বাহের ধরন অর্থাৎ পেশা, পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা, ভূমির পরিমাণ এবং মাসিক আয়ের চিত্রে দৃষ্টিপাত করলে অনায়াসে বোঝা সম্ভব যে, সিংহভাগ মানুষই দারিদ্র রেখার নীচে বসবাস করছে। সদস্য সংখ্যা ও মাসিক আয়ের প্রতি তুলনার মাধ্যমে যে বাস্তবচিত্রটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, এরা আর্থ সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের এবং জীবনের মৌল চাহিদা পূরণে অক্ষম একগুচ্ছ মানুষ।

৩.৩ দুর্যোগ–পূর্বাভাস/প্রচারের উৎস ও প্রতিক্রিয়া ঃ

আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস প্রচার এবং জ্ঞাত করানোর ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচার মাধ্যম/স্থানীয় প্রশাসন/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ যে ভূমিকা পালন করেছে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ সে সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নিম্নে প্রদর্শিত সারণী–৩, ৪, ৫, থেকে সংবাদ প্রাপ্তির উৎস ও প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বাচক রূপটি স্পষ্ট হতে পারে ঃ

সারণী–৩

সংবাদ প্রাপ্তির উৎস

মাধ্যম	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
রেডিও	৪০ জন	৫০%
স্থানীয় প্রশাসন	২৪ জন	৩০%
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	৫ জন	৬.২০%
সিপিপি কর্মী	৪৯ জন	৫৬.২৫%
অন্যান্য	৩৭ জন	৪৬.২৫%

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সারণী–৩ এর উত্তর দাতাদের মধ্যে অনেকে সংবাদ প্রাপ্তির একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।

নিম্নে সংবাদ প্রাপ্তির উৎসের স্পষ্টতর ধারণা অর্জনের জন্য দন্ডচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো–

উল্লিখিত প্রচারণা কার্যকারিতা নির্ণয় করতে গিয়ে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়–১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হওয়ার পূর্বে–

ঝড় সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল–৭৩ জন, জলোচ্ছ্বাসসহ ঝড় সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল– ৫৯ জন, এবং কোনটি সম্পর্কেই অবহিত ছিলো না– ৭ জন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড় সহ জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, এ পূর্বাভাস যে সংখ্যক ব্যক্তি জানতে পেরেছিল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এ প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বাস করেনি এবং বিশ্বাস না করার

সপক্ষে যে সকল কারণ উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে তার সংখ্যাবাচক রূপটি সারণী–৪ এবং সারণী–৫ এ প্রকাশ করা হলো ঃ

সারণী–৪

পূর্বাভাসঃ বিশ্বাস/অবিশ্বাস

প্রচারের প্রতিক্রিয়া	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ঝড় হবে বিশ্বাস করেছিল	৬২	৮৪.৯৩
ঝড় হবে বিশ্বাস করেনি	১১	১৫.০৭
মোট	৭৩	১০০.০০

দ্রষ্টব্যঃ ৭ জন ঝড় হবে জানত না।

যে ১১ জন ঝড়/জলোচ্ছ্বাস–এর পূর্বাভাস ও প্রচারণায় আস্থা স্থাপন করেন নি, অনাস্থার পক্ষে তারা নিম্নোক্ত মিশ্র কারণগুলোর কথা বলেছেন, এদের মধ্যে অনেকে একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

সারণী–৫

অবিশ্বাসের ভিত্তি

কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (N=১১)
প্রায়ই এ ধরনের সংবাদ সঠিক হয় না	৫ জন
ঝড় এতটা প্রবল হবে ধারণা করতে পারেন নি	৭ জন
ঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে জানতে পারেননি	৫ জন
ধারণা ছিল ঝড়/জলোচ্ছ্বাস তেমন ভয়াবহ হবে না	৯ জন

তথ্যাদির আলোকে দেখা যাচ্ছে উত্তর দাতাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন ঝড়/জলোচ্ছ্বাস–এর সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, ১৪ শতাংশ প্রচারণায় আস্থা রাখেননি এবং প্রায় ৯ শতাংশ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এ জন্য প্রচার মাধ্যমসমূহের আংশিক ব্যর্থতা এবং সমীক্ষাধীন ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাগত চেতনাগত নিম্নস্তরকে যুগপৎ দায়ী করা যেতে পারে।

৩.৪ আশ্রয় গ্রহণের ধরন

ঝড় শুরু হবার পূর্বে খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এঁরা মোট উত্তরদাতাদের মাত্র ২৫ শতাংশ। আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান কারণকে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলো হচ্ছে।

ক) নিকটবর্তী এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা

খ) ঝড় হতে পারে এ প্রচারণা বিশ্বাস না করা এবং

গ) বাড়িঘর, বিষয়সম্পদ অরক্ষিত রেখে গৃহত্যাগে অনীহা

সারণী–৬ এবং সারণী–৭ এ উপর্যুক্ত নির্ণীত কারণগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে

সারণী–৬

উত্তর দাতার বাড়ি থেকে আশ্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব

দূরত্ব	উত্তরদাতার সংখ্যা (N=৮০)	শতকরা হার
১–২ মাইল	৩৯	৪৮.৭৫
২–৪ মাইল	৩৯	৪৮.৭৫
৪–উর্ধ্বে	২	২.৫

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ জন, স্বগৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৫ জন, এবং অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫ জন। অর্থাৎ ৬০ জন বা ৭৫% আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এই ৬০ জন উত্তরদাতা কী কী কারনে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেননি তা নিচের সারণীতে প্রকাশিত হলো ঃ

সারণী–৭

আশ্রয় কেন্দ্রে না যাওয়ার কারণ

কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
ঝড় আসবে বিশ্বাস না করায়	১১	১৮.৩৩
ঝড় সম্পর্কে অবহিত না থাকায়	৭	১১.৬৬
নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায়	২০	৩৩.৩৩
বাড়ি ঘর অরক্ষিত রেখে যেতে না চাওয়ায়	১০	১৬.৬৬
নিজ বাড়িকেই মজবুত ও নিরাপদ মনে হওয়ায়	৫	৮.৩৩
ঝড় এতটা প্রবল হবে বুঝতে না পারায়	২	৩.৩৩
যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য	৪	৬.৬৬

৩.৫ ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ

আপৎকালীন প্রয়োজন হিসেবে ঔষধ/পানীয় জলের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় প্রচারমাধ্যম দুর্যোগের প্রাক্কালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখার মাধ্যমে ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য যে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, সমীক্ষাধীন এলাকায় এর ফলাফল শূন্য, অর্থাৎ একজন ব্যক্তিও নির্দেশমত ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ করেন নি। সারণী–৮ এ কারণসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে ঃ

সারণী–৮
ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ না করার কারণ

কারণ	সংখ্যা (N=৮০)	শতকরা হার
পদ্ধতি জানা ছিলো না	১০ জন	১৪.৪৯
ঔষধ ছিলো না	৫ জন	৭.১৪
প্রচারণা বুঝতে পারেন নি	৯ জন	১৩.০৪
এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না	২৯ জন	৪২.০৩
সময়ের স্বল্পতা	২ জন	২.৯০
প্রয়োজন মনে করেন নি	৬ জন	৮.৭০
পানি সংরক্ষণের পাত্রের অভাব	৮ জন	১১.৬০
মোট	৬৯ জন	১০০

৩.৬ ত্রাণ প্রাপ্তির উৎস, কাল, পদ্ধতি

দূর্যোগ–পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের। ত্রাণ সরবরাহ ও বিতরণ অর্থাৎ ত্রাণ–ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত ও সুষ্ঠু করবার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দুর্যোগের পর পুনরায় স্বাভাবিক জীবন সূচনার পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। ৯১'এর ঘূর্ণিঝড়–পরবর্তী সময়ে সমীক্ষাধীন এলাকায় ত্রাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া গিয়েছে তা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নয়। যেমন সারণী–৯ এ দেখা যাবে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী দিন অর্থাৎ যে মুহূর্তে ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন সর্বাধিক তখন দূর্যোগগ্রস্ত মানুষের কাছে কোনো ত্রাণ সামগ্রীই পৌছেনি।

সারণী–৯
ত্রাণ প্রাপ্তির সময়

ত্রাণ প্রাপ্তির সময়	ত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	শতকরা হার
প্রথম দিন	০	০
দ্বিতীয় দিন	১০	১৩.৩৩
পরবর্তী সময়ে	৬৫	৮৬.৬৭
মোট	৭৫	১০০

উত্তর দাতার সংখ্যা=৭৫ জন

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ের মেয়াদ হচ্ছে ৩য় দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ উত্তর দাতাদের মধ্যে এমন পরিবারও রয়েছে যারা এক মাস পর ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন। ৫ জন (সারণী–১০) অর্থাৎ ৬.২৫% এখনো ত্রাণ সাহায্য পাননি।

সারণী – ১০
সর্বপ্রথম ত্রাণ প্রাপ্তির উৎস

উৎস	সংখ্যা	শতকরা হার
সরকারি প্রতিষ্ঠান	৩৩	৪৪
রাজনৈতিক দল	৩	৪
এন জি ও	২২	২৯.৩৪
রেড ক্রিসেন্ট	১৩	১৭.৩৩
অন্যান্য (ছাত্র সংস্থা/ধনাঢ্য ব্যক্তি)	৪	৫.৩৩
মোট	৫৯	১০০

ত্রাণ বিতরণের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত উত্তরদাতাদের ২১ জন জানিয়েছেন বর্তমান পদ্ধতি যথার্থ এবং ৫৯ জন জানান বর্তমান পদ্ধতি যথার্থ নয়।

যে ৫৯ জন বর্তমান পদ্ধতিকে যথার্থ নয় বলেছেন, তাদের কাছে এজন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তারা যে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেন তা সারণী ১১–এর মাধ্যমে বোঝা যাবে ঃ

সারণী–১১
ত্রুটিপূর্ণ ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য দায়ী

ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/পদ্ধতি	সংখ্যা	শতকরা হার
ইউনিয়ন পরিষদ	৩৮	৬৪.৪১
প্রচলিত পদ্ধতি	১২	২০.৩৪
নিরুত্তর	৯	১৫.২৫
মোট	৫৯	১০০

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে ৫৯ জন উত্তরদাতাকে প্রশ্নকরা হয়েছিল যে, কার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরিত হলে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে যথাযথভাবে ত্রাণ সামগ্রী পৌছুতে পারে–এর উত্তরে যে সকল প্রস্তাবাবলী পাওয়া যায় তা ১২ নং সারণীতে প্রদর্শিত হলো ঃ

সারণী–১২

প্রস্তাবিত বিতরণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি

প্রস্তাবিত বিলিকারী	সংখ্যা	শতকরা হার
সৎ ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা	১৯ জন	৩১.২৩
সেনাবাহিনী	২৪ জন	৪০.৬৭
রেড ক্রিসেন্ট	৫ জন	৮.৪৭
সমন্বিত কার্যক্রম	৪ জন	৬.৭৮
এন জি ও	১ জন	১.৬৯
অন্যান্য (ছাত্র সংগঠন/রাজনৈতিক দল)	৬ জন	১০.১৬
মোট	৫৯ জন	১০০

দুর্যোগ–উত্তর সময়ে নতুনভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সূচনার জন্য উত্তর–প্রদানকারীগণ যে সকল সামগ্রীর সর্বাধিক প্রয়োজন ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) বিধ্বস্ত ঘর–বাড়ী সংস্কারের সামগ্রী, যেমন–টিন, ছন, খুঁটি, বাঁশ ইত্যাদি

(খ) কিছুদিন চলার মত খাদ্য সাহায্য,

(গ) ঔষধ

(ঘ) কৃষিঋণ, সার, বীজ, হালের গরু ইত্যাদি

(ঙ) নৌকা, জাল

(চ) নগদ অর্থ

৩.৭ মৃত্যু

দুর্যোগ যে সমস্ত সম্পদ হরণ বা বিনষ্ট করে, তারমধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হচ্ছে মানুষের প্রাণ। সমীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে দেখা যায়, এলাকাটিতে ঝড়ের মাত্রা তীব্র থাকলেও জলোচ্ছ্বাস তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করেনি, ফলে প্রাণহানির সংখ্যা তেমন বেশী নয়। ২৬ টি মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে দুটি কারণে মৃত্যু ঘটেছে বলে দেখা যায়– ক) সরাসরি ঝড়ে, খ) ঝড়–পরবর্তী অসুখে আক্রান্ত হয়ে।

সারণী–১৩-তে মৃত ব্যক্তিদের বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন দেখানো হলো ঃ

সারণী–১৩

মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন

বয়স	পুরুষ		মহিলা	
(বৎসর)	ঝড়ে	ঝড়–পরবর্তী অসুখে	ঝড়ে	ঝড়–পরবর্তী অসুখে
০–১০	৩	৪	১	২
১০–২০	২	০	০	০
২০–৩০	৬	০	০	০
৩০–৪০	৪	০	০	০
৪০–৫০	০	১	০	০
৫০ ও তদুর্ধ্ব	১	১	০	১
মোট	১৬	৬	১	৩

৩.৮ অসুখঃ চিকিৎসা/ঔষধ সহায়তা

দুর্যোগের পর বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমীক্ষাধীন এলাকায় এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ সরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা পেয়েছেন ২৭ জন, স্বেচ্ছাসেবী/বেসরকারি সংস্থা ১০ জন, রেডক্রিসেন্ট ১জন এবং অন্যান্য উৎস (ব্যক্তি/রাজনৈতিক/ছাত্র সংগঠন) ১৬ জন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২৬টি পরিবার কোনোরূপ চিকিৎসা সাহায্য পাননি। ঝড় পরবর্তী সময়ে মৃত্যুর জন্য এই অব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

৩.৯ আক্রান্ত মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসের সময় নিজকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করবার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করবেন–এ জিজ্ঞাসার জবাবে সাক্ষাৎকার-প্রদানকারীদের ব্যক্তিগত পরিকল্পনার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবেন ৬৩ জন, আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই ১১জন, এবং নিরুত্তর ছিলেন ৬জন। দেখা যাচ্ছে বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর অধিক সংখ্যক মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন।

পরবর্তী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয় জনসাধারণ সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে কী ধরনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন–এ সম্পর্কে ৮০ জন উত্তরদাতা যে ধরনের উত্তর দিয়েছেন স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে সেগুলোকে বেশ গঠনমূলক এবং বাস্তবানুগ বলে মনে হয়। সারণী–১৪ তে অভিমতগুলোকে সারণীবদ্ধ করা হলো ঃ

সারণী ১৪

ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ মানুষের সম্ভাব্য কর্মপন্থা

প্রস্তাবিত কর্মপন্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে	১২ জন	১৫
বাঁধ নির্মাণ করতে পারে	৪ জন	৫
কেল্লা তৈরী করতে পারে	২ জন	২.৫০
নদী সংলগ্ন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে	২২ জন	২৭.৫০
মানুষকে সচেতন করতে পারে	৫ জন	৬.২৫
বনায়ন/বৃক্ষরোপন করতে পারে	৬ জন	৭.৫
নিজেদের ঘরকে মজবুত করতে পারে	৪ জন	৫
কিছু করণীয় নেই	১৬ জন	২০
নিরূত্তর	৯ জন	১১.২৫

স্থায়ীভাবে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ৫০ জন অর্থাৎ ৬২.৫০ শতাংশ স্থানান্তর আগ্রহ প্রকাশ করেন, পক্ষান্তরে ৩০ জন অর্থাৎ ৩৭.৫ শতাংশ বর্তমান আবাস ত্যাগ করতে অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। অধিক সংখ্যায় অন্যত্র পুনর্বাসনে আগ্রহী ঠিকানাবিহীন মানুষদের মনোভাব থেকে এ সত্যটিই উদঘাটিত হয়েছে যে, বিশেষ কোনো স্থানের ব্যাপারে তাদের পক্ষপাত নেই, বরং দুর্যোগমুক্ত এলাকায় উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাই তাদের তাড়না করছে।

৪.০ প্রাপ্ত তথ্য/ফলাফলের বিশ্লেষণ

৩নং অনুচ্ছেদের উপ–অনুচ্ছেদসমূহে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের যে সংখ্যাবাচক বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে, নিম্নে তার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণমূলক একটি পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

ক) সমীক্ষাধীন এলাকার ৮০টি পরিবারের আর্থ–সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যে সত্য উদঘাটিত হয়েছে, তা হলো, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। নদীর ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিঃস্ব হয়ে ভাসমান জীবনের এক পর্যায়ে এসে তারা বেড়ী বাঁধের বহিরাংশে সরকারী খাস জমির ওপর ঘর বেঁধে বসবাস করছে। তাদের শিক্ষার হার প্রায় শূন্যের কোঠায়, দারিদ্র–সীমার অনেক নিচে তাদের বসবাস।

(খ) দুর্যোগের প্রাক্কালে দেখা যায়, সতর্কীকরণ বা পূর্বাভাস প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ রেডিও যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, অধিকাংশ মানুষেরই বেতারযন্ত্র ক্রয় করার মত অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের সামর্থ রয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণাধীন সিপিপি নামক

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্মীরা পূর্বাভাস প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সাইরেন বাজানো ও মাইকযোগে প্রচারণা ছিলো তাদের প্রধান কৌশল। সিপিপি-র ইউনিট প্রধানদের একটি করে রেডিও এবং তিনমাস অন্তর অন্তর ব্যাটারী সরবরাহ করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সতর্কীকরণের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/কর্মীরা উল্লেখ করবার মত তৎপরতা দেখাতে পারেননি। মাত্র ২৪ জন তাদের মাধ্যমে ঝড় সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন, সংখ্যা বিচারে যা সন্তোষজনক নয়।

(গ) ১৫ শতাংশ ব্যক্তি ঝড়/জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত প্রচারণা বিশ্বাস করেননি। এই ১১ জনের মধ্যে ৫ জন বলেছেন প্রায়ই এ ধরনের সংবাদ সঠিক হয় না। অর্থাৎ তাদের কাছে প্রচার মাধ্যমগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে। অবশিষ্ট ৬ জন ব্যক্তি অনুমান/অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংবাদটিকে অবিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, একজন কৃষক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। যেমন এদের মধ্যে একজন কৃষিজীবী বলেছেন, এবার ঝড়ের এবং জোয়ারের সময় কাছাকাছি না হওয়ায় তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তার অনুমানটি প্রায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

(ঘ) সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, ৭৫ শতাংশ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এদের মধ্যে ২৪ জন অর্থাৎ ৪০ শতাংশই নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে না থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে যান নি। পরবর্তীতে ভবিষ্যত দুর্যোগের সময় কি ব্যবস্থা নেবেন-এ প্রশ্নের উত্তরেও ৬৩ শতাংশ নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেবেন বলে জানান। অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ শতাংশ মানুষই আশ্রয় কেন্দ্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। কিন্তু এদের মধ্যে ৪০ শতাংশকে আশ্রয়কেন্দ্র নিকটবর্তী না হওয়ায় সেখানে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুসন্ধানে দেখা যায়, সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদের বাড়ী থেকে আশ্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব ন্যূনতম এক মাইল এবং সর্বোচ্চ সাত মাইল, যা আশ্রয় গ্রহণের জন্য কোনক্রমেই সুবিধাজনক নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দুর্যোগকালে নিজবাড়ীতে অবস্থান করেছেন, কারণ জীবন রক্ষার পাশাপাশি তাদের কাছে কষ্টার্জিত সম্পদ রক্ষাও সমান জরুরী।

(ঙ) দূর্যোগ-পরবর্তী সময়ে পানীয় জলের এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধের সংকট তীব্র হয়ে থাকে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণের একটি আয়াসসাধ্য ও বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু নমুনা-এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় ২৯ জন এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, বেতারযন্ত্র না থাকা এজন্য দায়ী। ৬৯ জন উত্তর দাতার মধ্যে অবশিষ্ট সকলে অবহিত থাকলেও নানাবিধ কারণে সংরক্ষণ করেননি, যেমন-ঔষধের পাত্রের অভাব, সময় স্বল্পতা, পানির চেয়ে জীবন ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করা অধিক জরুরী মনে করা ইত্যাদি। ৯ জন প্রচারণা শুনে থাকলেও বুঝতে পারেননি, অর্থাৎ প্রচারের ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

(চ) দুর্যোগের অবসান ঘটলে বিপন্ন মানুষের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে-ত্রাণসামগ্রী। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী দিনে যখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় দুর্যোগগ্রস্ত মানুষ ব্যাকল, সে মুহূর্তে তাদের কাছে কোনো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছেনি। এ বিষয়ে ত্রাণ বিতরণের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে, থানা সদরের সাথে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গিন অবস্থাই এই ব্যর্থতার কারণ। উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নটির দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে চার কিলোমিটার পথ পাকা, বাকী অংশটুকু বর্ষণের পর সম্পূর্ণ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যার ফলে ত্রাণ সরবরাহ বিলম্বিত হয়। ত্রাণ বিতরণের প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫৯ জন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে ২৪ জনই সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যতে ত্রাণ বিতরণকারী হিসেবে তাদের পছন্দনীয় বলে জানিয়েছেন। বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর এঅঞ্চলে যদিও সেনাবাহিনী বেশ কিছুদিন পর ত্রাণ বিলি করেছেন, কিন্তু উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমিত হয় যে, তাদের ত্রাণ বিতরণের ধরনটি ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং পক্ষপাতমুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তদাতাই কৃষিজীবী, দূর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জীবন ধারণের জন্য খাদ্যসাহায্যের পাশাপাশি কৃষিঋণ ও উপকরণ প্রাপ্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মৎস্যজীবীরা চেয়েছেন মাছ ধরার জাল ও নৌকা, দিনমজুররা চেয়েছেন কর্মসংস্থান অর্থাৎ এ-থেকে তাদের-সাহায্য নির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভর হবার প্রত্যয়টি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে অদ্যাবধি তাদের কাছে কৃষিঋণ পৌঁছানো যায়নি।

(ছ) দুর্যোগ পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ৯জন। ২৬টি পরিবার কোনোরূপে চিকিৎসা সহায়তা লাভ করেনি। অর্থাৎ এই জরুরী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। যথাসময়ে ঔষধ সরবরাহ এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে ঝড়-পরবর্তী মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমানো যেত।

(জ) বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর অভিজ্ঞতার আলোকে সমীক্ষাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ভবিষ্যতে নিজস্ব উদ্যোগে সংঘবদ্ধভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধে কি ধরনের কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে পারে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কিছু গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে, যার প্রেক্ষিতে নিরক্ষর উত্তরদাতাদের এক-একজনকে সুলিখিত প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, কেও কেও বলেছেন বাঁধ নির্মাণের কথা। বাস্তবিকভাবেই এঅঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে যে বাঁধটি রয়েছে সেটি সত্তুর দশকের প্রথমদিকে নির্মিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাঁধের ও পাশের নদী মজে গিয়ে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ চর, ফলে বর্তমান বাঁধ থেকে আরো দক্ষিণে উঁচু বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজনীয়।

আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, কেল্লা নির্মাণ, মানুষকে সচেতন করে তোলা এ-ধরনের পরিকল্পনা ছাড়াও অনেকেই বলেছেন বনায়ন/বৃক্ষরোপণের কথা, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিপুল অবদান রাখতে পারে। বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া যে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ, প্রকৃতির সন্নিকটে বসবাসের মাধ্যমে এ সত্য তারা জেনে গিয়েছেন। অস্তিত্বের তাগিদে যে সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাশ্রম তারা দিতে ইচ্ছুক, পরিকল্পিত উপায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই শ্রমকে তাদের জীবন রক্ষার হাতিয়ারে রূপান্তর করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮০ জনের মধ্যে ১৬জন অর্থাৎ ২০ শতাংশ ব্যক্তি দুর্যোগের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ